Vol. 49 | No. 3 | 2012

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

রবীন্দ্রনাথের চোখের বালি

Volume	49
Issue	3
Year	2012
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Gias Shamim
Published online	June 1, 2012
DOI	10.62328/sp.v49i3(2).6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v49i3(2).6
Pages	৯৯-১২৩
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

রবীন্দ্রনাথের *চোখের বালি*

Check for updates

গিয়াস শামীম*

বাংলা উপন্যাসের ক্রমবিকাশমান ধারায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) *চোখের বালি* (১৯০৩) উপন্যাসের অবস্থান স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত। এ-উপন্যাসের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিম-প্রদর্শিত ঘটনাপ্রধান সমাজসমস্যাশ্রয়ী উপন্যাসের ধারা থেকে সরে এসেছেন এবং আত্মনিয়োগ করেছেন মনস্তত্ত্বপ্রধান উপন্যাস রচনায়। উনিশ শতকব্যাপী ইতিহাস-আশ্রিত রোমান্স, রোমান্সপ্রধান সামাজিক উপন্যাস এবং ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার যে প্রবণতা বঙ্কিমচন্দ্র- রমেশচন্দ্র-সঞ্জীবচন্দ্র- মীর মশাররফ প্রদর্শন করেছিলেন, একই শতাব্দীতে সে-ধারার অনুবর্তী থেকেছেন রবীন্দ্রনাথ, এবং রচনা করেছেন *করুণা*, *বউ-ঠাকুরানীর হাট*, *রাজর্ষি*। বিগত শতাব্দীর কয়েক দশকব্যাপী অনুসৃত শিল্পপ্রবণতা থেকে রবীন্দ্রনাথ অবশেষে বেরিয়ে এলেন, এবং বিংশ শতাব্দীর সূচনাপর্বে রচনা করলেন সমকালীন পরিপ্রেক্ষিতে অভিনব ও বিতর্কিত উপন্যাস *চোখের বালি*। কবি সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ এ-উপন্যাসে উপস্থাপন করেছেন রোমান্টিক স্বপ্নকল্পনা, আবেগময় প্রেমানুভূতি, অবাস্তব আদর্শবিলাস, কবিতাময় জীবনানুভব এবং ব্যক্তিচেতনাশ্রয়ী জীবনার্থ। চরিত্রচিত্তের প্রেমাকাঙ্ক্ষা, অচরিতার্থতা, অন্তর্জ্বালাময় অস্থিরতা, বেদনাকাতর সন্তোষ ও ক্লাসিক পরিতৃপ্তি এ-উপন্যাসের দুর্লভ সম্পদ। 'সেদিনকার বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে' *চোখের বালি* আকস্মিক; যুগ-আকাঙ্ক্ষার শৈল্পিক প্রতিফলক। পরবর্তীকালের সাহিত্যে, বিশেষত উপন্যাস-সাহিত্যে, এর আবেদন নিঃসন্দেহে সুদূরসঞ্চারী।

দুই

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম পর্যায়ের উপন্যাসে পূর্বসূরি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে অনুসরণ করলেও *চোখের বালি* উপন্যাসে তিনি স্পষ্টত উপন্যাসের এক বিরল ও স্বতন্ত্র ভূমিখণ্ড আবিষ্কারে সক্ষম হন; যা বঙ্কিমচন্দ্র থেকে সুদূরবর্তী। উপন্যাসে বঙ্কিম ছিলেন ঘটনামুখী; ব্যক্তি এবং ব্যক্তিত্ব-আশ্রয়ী ঘটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তাঁর উপন্যাসে মুখ্য। রবীন্দ্রনাথ *বউ-ঠাকুরানীর হাট* থেকে ঘটনানির্ভর ঔপন্যাসিক-পদ্ধতি পরিহার করে ক্রমশ ব্যক্তির অন্তরবাসী সত্তার চিত্রাঙ্কনে উৎসাহিত বোধ করেন, এবং রচনা করেন *চোখের বালি*।

চোখের বালি তাই ঘটনাপ্রধান নয়, মনস্তত্ত্বপ্রধান উপন্যাস। এর ঘটনাংশ চরিত্রের চেতনাশ্রয়ী। বহির্জাগতিক ঘটনাংশের প্রভাব এ-উপন্যাসে ক্ষীণ। চরিত্রের আশা-আকাঙ্ক্ষা, হতাশা-ব্যর্থতা, চাওয়া-পাওয়া, দুঃখ-দাহ-যন্ত্রণা সবকিছুর নিয়ন্তা হয়ে উঠেছে তার মনোজগৎ। উনিশ শতকীয় ঘটনাধর্মিতা পরিহার করে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তির অন্তস্তল-আশ্রয়ী চেতনাপ্রবাহের যে শব্দরূপ নির্মাণ করেছেন তা সমকালীন পরিপ্রেক্ষিতে তুলনাবিরল।

*অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উপনিবেশিত বাংলাদেশে অবিকশিত মধ্যশ্রেণির দোদুল্যচিত্ততা এ-উপন্যাসের চরিত্রপুঞ্জের পৌনঃপুনিক দ্বন্দ্বজটিল অভিক্ষেপের অবশ্যম্ভাবী কার্যকারণ। *চোখের বালি* তাই সমাজের অন্তঃশীল গতিপ্রক্রিয়া-প্রভাবিত সমান্তরাল সাহিত্যকর্ম; বিচ্ছিন্নমূল কোনো সৃষ্টি নয়, 'আকস্মিক'ও নয়। রবীন্দ্রনাথ যেহেতু একইসঙ্গে ঐতিহ্যনিষ্ঠ, যুগজাত এবং যুগাতিক্রমী সাহিত্যপ্রতিভা, সেহেতু সমকালীন সমাজমানসের অবচেতন-উৎসারিত ভাবনাপ্রবাহ অনুধাবনে তিনি সক্ষম ছিলেন এবং নির্মাণ করেছেন *চোখের বালি*। এটি একান্তই ব্যক্তিত্বের অন্তরাত্মা-উৎসারিত অনুভব-উপলব্ধির শীলিত রূপায়ণ। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

> সাহিত্যের নবপর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনাপরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো। সেই পদ্ধতিই দেখা দিল চোখের বালিতে। (সূচনা : *চোখের বালি*)

ব্যক্তিমানুষের 'আঁতের কথা বের করে দেখানো'র শিল্পিত প্রয়াস *চোখের বালি*। এটি মনস্তত্ত্বসম্মত উপন্যাস। 'কিন্তু তাই বলে মনস্তাত্ত্বিক লেখক হতে গিয়ে তিনি কদাচ একদল মনোচিকিৎসকের গবেষণার বিষয়কে উপন্যাসে জড়ো করেননি। দেহে-মনে সুস্থ ব্যক্তির কথাই বলেছেন' (সরোজ ১৯৮০ : ১৩৩)। এ-ব্যক্তিমানুষ মাথা গণনায় কেবলই একজন হলেও অন্তর্লোকে লালন করে অসংখ্য মানুষ; এবং যার সম্পর্কে কোনো বৈজ্ঞানিক পরিমাপই চূড়ান্ত নয়। এ-মানুষ বহুধা বৈচিত্র্যময়, নানা ঘাত-সংঘাতে মুখর, চাওয়া আর না-পাওয়ার দ্বন্দ্বে বিক্ষত, আশাবাদী অথচ ভগ্নচিত্ত, নিয়ত অন্তর্জ্বালাতাড়িত, তৃপ্তি-অতৃপ্তির দোলাচলে সংক্ষুব্ধ, কখনো আশাবাদী আবার কখনো নিরাশার অতল তলে নিমজ্জিত।

তিন

চোখের বালি উপন্যাসের ঘটনাংশ আদি-মধ্য-অন্ত্যযুক্ত–সমগ্র। এর বিন্যাসরীতি প্রচলিত উপন্যাসের ধারানুবর্তী। সর্বমোট ৫৫ পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত এ-উপন্যাস মহেন্দ্র-আশা-বিনোদিনী-বিহারীর চিত্তজাগতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার শব্দরূপ হলেও এখানকার উদ্ভূত সমস্যা-সংকট, সামূহিক জটিলতা ও পরিণাম একান্তই বিনোদিনীকেন্দ্রিক। এর গঠন-পরিকল্পনা নাট্যাশ্রয়ী; বলা যায় নাটকের মতোই পঞ্চসন্ধিসমন্বিত। উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহকে ৫টি স্তরে বিন্যস্ত করা যায় :

প্রথম স্তর : পরিচ্ছেদ ১ থেকে পরিচ্ছেদ ৯
দ্বিতীয় স্তর : পরিচ্ছেদ ১০ থেকে পরিচ্ছেদ ১৬
তৃতীয় স্তর : পরিচ্ছেদ ১৭ থেকে পরিচ্ছেদ ৩৪
চতুর্থ স্তর : পরিচ্ছেদ ৩৫ থেকে পরিচ্ছেদ ৫১
পঞ্চম স্তর : পরিচ্ছেদ ৫২ থেকে পরিচ্ছেদ ৫৫

এ-পাঁচটি স্তর স্পষ্টতই বিনোদিনীর জীবন ও পরিণামকেন্দ্রিক। বিনোদিনীকে কেন্দ্রে রেখে ঔপন্যাসিক এ-উপন্যাসের উৎসমুখ যেমন উন্মোচন করেছেন, ঠিক তেমনি করে তুলেছেন বিকশিত ও পরিণামমুখী। উপন্যাসের পরিণাম আর বিনোদিনীর পরিণাম যেন সমান্তরাল

ধারানুবর্তী। উপন্যাসের ১-সংখ্যক পরিচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ বিনোদিনী প্রসঙ্গে বলেছেন — সে সুন্দরী, শিক্ষিতা, আধুনিক জীবনের উপযোগী। তবুও উপন্যাসের সাক্ষ্য অনুযায়ী তাকে উদ্ধারে আগ্রহী হয়নি মহেন্দ্র। বিহারীও এ-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ফলে রাজলক্ষ্মী তাঁর জন্মভূমি বারাসতের গ্রামসম্পর্কীয় ভ্রাতুষ্পুত্র বিপিনের সঙ্গে বিয়ে দেন বিনোদিনীর। অনতিকাল ব্যবধানে বৈধব্যদশায় নিক্ষিপ্ত হয় বিনোদিনী, এবং নিরানন্দ পল্লির মধ্যে মুহ্যমান জীবনযাপনে বাধ্য হয়।

বছর তিনেকের ব্যবধানে মহেন্দ্র বিয়ে করে আশালতাকে। মহেন্দ্র আশালতার লাগামহীন দাম্পত্যলীলায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে অভিমানাহত রাজলক্ষ্মী অবশেষে বিহারীকে নিয়ে উপস্থিত হন বারাসতের মাত্রালয়ে। এই পর্যায়ে পল্লির শ্রীহীন জীবনপরিসরে বিনোদিনীর সান্নিধ্য ও সেবাধর্মে রাজলক্ষ্মী যখন পরিতৃপ্ত, তখনই মহেন্দ্র তার উন্মাতাল দাম্পত্যলীলার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে পত্র প্রেরণ করে বিহারীকে। এ-পত্র জীবনবঞ্চিত বিনোদিনীর ভাবনালোকে সঞ্চারিত করে নবতর জীবনরসোপলব্ধি :

> চিঠির মধ্যে বিনোদিনী কী রস পাইল, তাহা বিনোদিনীই জানে। কিন্তু তাহা কৌতুকরস নহে। বারবার করিয়া পড়িতে পড়িতে তাহার দুই চক্ষু মধ্যাহ্নের বালুকার মতো জ্বলিতে লাগিল, তাহার নিশ্বাস মরুভূমির বাতাসের মতো উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। (পরিচ্ছেদ ৭)

উপন্যাসের দ্বিতীয় স্তরের শুরু ১০-সংখ্যক পরিচ্ছেদ থেকে। এ-পর্যায়ে রাজলক্ষ্মী বারাসত থেকে বিনোদিনীকে নিয়ে আসেন কলকাতায়। আশার প্রতি রাজলক্ষ্মীর বিমুখতা সত্ত্বেও কর্মপটু বিনোদিনীর সঙ্গে সংসার-অনভিজ্ঞ আশালতার গড়ে ওঠে নিকটসম্পর্ক। 'জাদুকরের মায়াতরুর মতো তাহাদের প্রণয়বীজ একদিনেই অঙ্কুরিত পল্লবিত ও পুষ্পিত হইয়া উঠিল।' তারা হয়ে উঠল পরস্পরের চোখের বালি। অতঃপর সরলচিত্ত আশালতার পরিণামহীন বক্তব্য বিনোদিনীকে উৎসুক করে তোলে মহেন্দ্র-ভাবনায় :

> একবার মনে করিয়া দেখো দেখি ভাই বালি, যদি আমার স্বামীর সঙ্গে তোমার বিবাহ হইয়া যাইত! আর-একটু হলেই তো হইত।
>
> তা তো হইতই। না হইল কেন। আশার এই বিছানা, এই খাট তো একদিন তাহারই জন্য অপেক্ষা করিয়া ছিল। বিনোদিনী এই শয়নঘরের দিকে চায়, আর সে কথা কিছুতেই ভুলিতে পারে না। (পরিচ্ছেদ ১১)

ক্ষুধিতহৃদয়া বিনোদিনী এ-সময় কল্পনায় আশালতা সেজে মহেন্দ্রের সঙ্গে প্রণয়াভিসারে যাত্রা করত :

> অপরাহ্নে বিনোদিনী নিজে উদ্‌যোগী হইয়া অপরূপ নৈপুণ্যের সহিত আশার চুল বাঁধিয়া সাজাইয়া তাহাকে স্বামিসম্মিলনে পাঠাইয়া দিত। তাহার কল্পনা যেন অবগুণ্ঠিতা হইয়া এই সজ্জিতা বধূর পশ্চাৎ পশ্চাৎ মুগ্ধ যুবকের অভিসারে জনহীন কক্ষে গমন করিত। (পরিচ্ছেদ ১১)

আশালতার সামনে বিনোদিনী এ-পর্যায়ে মহেন্দ্র সম্পর্কে প্রকাশ্যে নিস্পৃহতা প্রদর্শন করলেও পরোক্ষে পোষণ করেছে সংগোপন আগ্রহ। আশার সরল নিস্পৃহতার সুযোগে 'ফোটোগ্রাফ-অভ্যাস' এবং 'ওডিকলোন' সেবনকে উপলক্ষ করে মহেন্দ্র এবং বিনোদিনী যখন পরস্পরের প্রতি মনোময় অনুভূতিতে জাগ্রত, তখনই আশার প্রতি সমবেদনাসূত্রে

মহেন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে বিহারী ব্যক্ত করে তার সন্দেহক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া, যা একান্তই পরিস্থিতিতাড়িত এবং বিনোদিনীর প্রতি নেতিবাচক ধারণা থেকে উৎসারিত :

> ...বিনোদিনী তোমাকে ইচ্ছা করিয়া অধর্মের দিকে টানিতেছে এবং তুমি না জানিয়া মূঢ়ের মতো অপথে পা বাড়াইতেছ। (পরিচ্ছেদ ১৬)

চোখের বালি উপন্যাসের তৃতীয় স্তরের শুরু ১৭-সংখ্যক পরিচ্ছেদ থেকে। এ-পর্যায় থেকে বিনোদিনীর মনোজগতে সূচিত হয় লক্ষণীয় পরিবর্তন। দমদমের বাগানে মধ্যাহ্ন প্রকৃতির সংস্পর্শে ও সান্নিধ্যে স্মৃতিতাড়িত বিনোদিনী যখন বিহারীকে উদ্দেশ্য করে আবেগায়িত অনুষঙ্গে তার জীবনকথা ব্যক্ত করতে শুরু করে, তখনই বিহারী তার মধ্যে প্রত্যক্ষ করে এক কল্যাণী সত্তাকে —

> বিনোদিনীর চক্ষে যে কৌতুকতীব্র কটাক্ষ দেখিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টি বিহারীর মনে এ পর্যন্ত নানাপ্রকার সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, সেই উজ্জ্বলকৃষ্ণ জ্যোতি যখন একটি শান্তসজল রেখায় ম্লান হইয়া আসিল তখন বিহারী যেন আর-একটি মানুষ দেখিতে পাইল। এই দীপ্তিমণ্ডলের কেন্দ্রস্থলে কোমল হৃদয়টুকু এখনো সুধাধারায় সরস হইয়া আছে, অপরিতৃপ্ত রঙ্গ-রস-কৌতুকবিলাসের দহনজ্বালায় এখনো নারীপ্রকৃতি শুষ্ক হইয়া যায় নাই। বিনোদিনী সলজ্জ সতীস্ত্রীভাবে একান্ত-ভক্তিভরে পতিসেবা করিতেছে, কল্যাণপরিপূর্ণা জননীর মতো সন্তানকে কোলে ধরিয়া আছে, এ ছবি ইতিপূর্বে মুহূর্তের জন্যও বিহারীর মনে উদিত হয় নাই — আজ যেন রঙ্গমঞ্চের পটখানা ক্ষণকালের জন্য উড়িয়া গিয়া ঘরের ভিতরকার একটি মঙ্গলদৃশ্য তাহার চোখে পড়িল। বিহারী ভাবিল, 'বিনোদিনী বাহিরে বিলাসিনী যুবতী বটে, কিন্তু তাহার অন্তরে একটি পূজারতা নারী নিরশনে তপস্যা করিতেছে।'(পরিচ্ছেদ ১৭)

রাজলক্ষ্মীর অসুস্থতাকে উপলক্ষ করে বিনোদিনী যখন মহেন্দ্র এবং প্রাত্যহিক গৃহকর্ম থেকে সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, এবং তার দক্ষ হাতের পরিচর্যা থেকে বঞ্চিত হয়ে সংসার হয়ে যায় এলোমেলো ও শ্রীহীন, তখন বিনোদিনীর সঙ্গে তুলনা-প্রতিতুলনায় মহেন্দ্র কেবলই আশার মধ্যে অপটুতা প্রত্যক্ষ করে। পড়ালেখার অজুহাতে অবশেষে মহেন্দ্র গৃহপরিবেশ ত্যাগ করে চলে যায় কলেজের পার্শ্ববর্তী ছাত্রাবাসে। মহেন্দ্রের অনুপস্থিতিতে সংসারক্ষেত্রে বিনোদিনীর অস্বস্তি চরমে ওঠে। মহেন্দ্রবর্জিত আশাও তার কাছে হয়ে ওঠে একান্তই বিস্বাদ। এক অনামা যন্ত্রণা তাকে আমূল বিদ্ধ করে :

> 'কোনো নারীর কি আমার মতো এমন দশা হইয়াছে। আমি মরিতে চাই কি মারিতে চাই তাহা বুঝিতেই পারিলাম না।' কিন্তু যে কারণেই বল, দগ্ধ হইতেই হউক বা দগ্ধ করিতেই হউক, মহেন্দ্রকে তাহার একান্ত প্রয়োজন। (পরিচ্ছেদ ১৯)

এ-পর্যায়ে আশালতার প্রতি বিহারীর সহানুভূতির পরিপ্রেক্ষিতে বিনোদিনী সংসারক্ষেত্রে কেবলই তার বঞ্চনাকে প্রত্যক্ষ করে। প্রতিহিংসায় জেগে ওঠে সে। বিহারী ও মহেন্দ্রকে সমুচিত শিক্ষাদানের সংকল্পে সে হয়ে ওঠে একাগ্রচিত্ত —

> আজ বিহারীকে দেখিয়াই সে বুঝিয়াছিল যে, আশার জন্য করুণায় তাহার হৃদয় ব্যথিত। বিনোদিনী নিজে কেহই নহে! আশাকে ঢাকিয়া রাখিবার জন্য, আশার পথের কাঁটা তুলিয়া দিবার জন্য, আশার সমস্ত সুখ সম্পূর্ণ করিবার জন্যই তাহার জন্ম! শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রবাবু আশাকে বিবাহ করিবেন, সেইজন্য অদৃষ্টের তাড়নায় বিনোদিনীকে বারাসতের বর্বর বানরের সহিত

বনবাসিনী হইতে হইবে। শ্রীযুক্ত বিহারীবাবু সরলা আশার চোখের জল দেখিতে পারেন না, সেইজন্য বিনোদিনীকে তাহার আঁচলের প্রান্ত তুলিয়া সর্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে। একবার এই মহেন্দ্রকে, এই বিহারীকে, বিনোদিনী তাহার পশ্চাতের ছায়ার সহিত ধুলায় লুণ্ঠিত হইয়া বুঝাইতে চায় আশাই বা কে আর বিনোদিনীই বা কে। দুজনের মধ্যে কত প্রভেদ। (পরিচ্ছেদ ১৯)

ছাত্রাবাস থেকে প্রত্যাবর্তনের স্বল্পকাল ব্যবধানে মহেন্দ্র বুঝতে পারে যে, বিনোদিনীর সঙ্গে বিহারীর সম্পর্ক অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ ও আন্তরিক। এমতাবস্থায় সাময়িক স্বস্তি সন্ধানের জন্যে সে কাশীতে চলে যায় অন্নপূর্ণার সন্নিধানে। কাশী থেকে প্রত্যাবর্তনের পর আশালতাও কাশীতে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে। এ-পর্যায়ে বিহারী চায় আশাকে প্রয়োজনীয় সান্ত্বনা ও সঙ্গদানের জন্য বিনোদিনীও আশার সঙ্গী হোক। কিন্তু যে-মহেন্দ্র আশাহীন সংসারে বিনোদিনীকে নিয়ে তার প্রতিটি মুহূর্ত লীলালাস্যে পূর্ণ করে তুলতে চায়, বিহারীর অনাহূত তৎপরতার পরিপ্রেক্ষিতে সেই মহেন্দ্র তীব্র চিৎকারে বিস্ফারিত হয়ে উচ্চারণ করে—

...আমি জানি, তুমি মনে মনে সন্দেহ করিয়াছ, আমি বিনোদিনীকে ভালোবাসি। মিথ্যা কথা। আমি বাসি না। আমাকে রক্ষা করিবার জন্য তোমাকে পাহারা দিয়া বেড়াইতে হইবে না। তুমি এখন নিজেকে রক্ষা করো। ...আমি তোমার মুখের সামনে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, তুমি আশাকে ভালোবাসিয়াছ। (পরিচ্ছেদ ২৩)

বেদনাহত বিহারীর উদ্দেশে প্রেরিত বিনোদিনীর সান্ত্বনাসূচক পত্র মহেন্দ্রের বক্রবুদ্ধির শিকার হয়ে পরিশেষে ফেরত আসে বিনোদিনীর কাছে। বিনোদিনী জানে না যে এই পত্রপ্রাপ্তির পূর্বেই পশ্চিমে চলে গেছে বিহারী। এমতাবস্থায় বিনোদিনীর যে ক্ষুব্ধ ও নিষ্করুণ প্রতিক্রিয়া তার স্বরূপ অনুধাবনীয় :

ক্রুদ্ধা মধুকরী যাহাকে সম্মুখে পায় তাহাকেই দংশন করে, ক্ষুব্ধা বিনোদিনী তেমনি তাহার চারিদিকের সমস্ত সংসারটাকে জ্বালাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। (পরিচ্ছেদ ২৪)

অতঃপর রঙ্গমঞ্চে বিনোদিনীর ভূমিকা হয়ে ওঠে রহস্যাচ্ছন্ন। মহেন্দ্রও দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে আশালতার কাছে। বিনোদিনীর সঙ্গে নৈকট্যঘন সম্পর্ক রচনার অভিপ্রায়ে আশাকে কৌশলে কাশীতে প্রেরণ করে মহেন্দ্র। আশার অনুপস্থিতিতে রাজলক্ষ্মী চান তাঁর 'দেবদূততুল্য' পুত্রের পরিচর্যা করুক বিনোদিনী। অতঃপর গৃহের সীমিত অঙ্গন হয়ে ওঠে মহেন্দ্র-বিনোদিনীর বিলাসকুঞ্জ। রবীন্দ্রনাথ মহেন্দ্র-বিনোদিনীর এই পর্যায়ের মনোদৈহিক কম্পন-শিহরন প্রকৃতি পরিসরের সঙ্গে একাকার করে পরিবেশন করেছেন :

... অলস মধ্যাহ্নের উত্তপ্ত হাওয়ায় ঘরের পর্দা উড়িতে লাগিল এবং প্রাচীরের কাছে কম্পমান নারিকেল গাছের অর্থহীন মর্মরশব্দ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। মহেন্দ্রের হৃৎপিণ্ড ক্রমশই দ্রুততর তালে নাচিতে লাগিল এবং বিনোদিনীর ঘন নিশ্বাস সেই তালে মহেন্দ্রের কপালের চুলগুলি কাঁপাইতে থাকিল। কাহারো কণ্ঠ দিয়া একটি কথা বাহির হইল না। মহেন্দ্র মনে মনে ভাবিতে লাগিল, 'অসীম বিশ্বসংসারের অনন্ত প্রবাহের মধ্যে ভাসিয়া চলিয়াছি, তরণী ক্ষণকালের জন্য কখন কোথায় ঠেকে, তাহাতে কাহার কী আসে যায় এবং কতদিনের জন্যই বা যায় আসে।'

> শিয়রের কাছে বসিয়া কপালে হাত বুলাইতে বুলাইতে বিহ্বল যৌবনের গুরুভারে ধীরে ধীরে বিনোদিনীর মাথা নত হইয়া আসিতেছিল; অবশেষে তাহার কেশাগ্র-ভাগ মহেন্দ্রের কপোল স্পর্শ করিল। বাতাসে আন্দোলিত সেই কেশগুচ্ছের কম্পিত মৃদু স্পর্শে তাহার সমস্ত শরীর বারংবার কাঁপিয়া উঠিল, হঠাৎ যেন নিশ্বাস তাহার বুকের কাছে অবরুদ্ধ হইয়া বাহির হইবার পথ পাইল না! (পরিচ্ছেদ ২৮)

মহেন্দ্রের সঙ্গে এই আপত্তিকর ঘনিষ্ঠতা প্রত্যক্ষ করে বিনোদিনীর প্রতি ঘৃণাবোধে জেগে ওঠে বিহারী। মহেন্দ্রও বিনোদিনীর সঙ্গে মিলন ও ঘনিষ্ঠতায় বিহারীকে প্রবল বাধা হিসেবে গণ্য করে। ফলত দুই বন্ধুর মধ্যে তৈরি হয় দূরত্ব। এই পর্যায়ে আশাও কাশী থেকে প্রত্যাবর্তন করে। কিন্তু আশার প্রতি মহেন্দ্র এ-পর্যায়ে প্রদর্শন করে লক্ষণীয় নিস্পৃহতা। আশার সলজ্জ স্নিগ্ধমূর্তিকে আবৃত-আচ্ছন্ন করে তার স্মৃতিলোকে দীপ্যমান হয়ে ওঠে বিনোদিনীর তীব্র-উজ্জ্বল রমণীমূর্তি। তাই বহুদিনের রুদ্ধ আকাঙ্ক্ষার বিরামহীন তাড়নায় জ্যোৎস্নানিশীথে মহেন্দ্র অবচেতনসত্তায় উপস্থিত হয় বিনোদিনীর সান্নিধ্যে—

> মহেন্দ্রের বহু দিনের রুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা আপনাকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিল না। আশা কাশী হইতে ফিরিয়া অবধি, বিনোদিনী তাহাকে দেখা দেয় নাই। জ্যোৎস্নামদবিহবল নির্জন রাত্রি মহেন্দ্রকে মোহাবিষ্ট করিয়া বিনোদিনীর দিকে ফিরিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। মহেন্দ্র সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল। বিনোদিনীর ঘরের সম্মুখের বারান্দায় আসিয়া দেখিল, ঘর বন্ধ নাই। ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, বিছানা তৈরি রহিয়াছে, কেহ শোয় নাই। ঘরের মধ্যে পদশব্দ শুনিতে পাইয়া ঘরের দক্ষিণ দিকের খোলা বারান্দা হইতে বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, "কে ও।"
>
> মহেন্দ্র অভিভূত আর্দ্র কণ্ঠে উত্তর করিল, "বিনোদ, আমি।"
>
> বলিয়া সে একেবারে বারান্দায় আসিয়া উপস্থিত হইল।
>
> গ্রীষ্মরাত্রিতে বারান্দায় মাদুর পাতিয়া বিনোদিনীর সঙ্গে রাজলক্ষ্মী শুইয়া ছিলেন; তিনি বলিয়া উঠিলেন, "মহিন, এত রাত্রে তুই এখানে যে।"
>
> বিনোদিনী তাহার ঘনকৃষ্ণ ভ্রূযুগের নীচে হইতে মহেন্দ্রের প্রতি বজ্রাগ্নি নিক্ষেপ করিল। মহেন্দ্র কোনো উত্তর না দিয়া দ্রুতপদে সেখান হইতে চলিয়া গেল। (পরিচ্ছেদ ৩২)

অতঃপর ঘটনাংশ নিক্ষিপ্ত হয় জটিল আবর্তে। মহেন্দ্রের দায়িত্বজ্ঞানহীন অসাবধানতায় বিনোদিনীর পত্র আশার হস্তগত হয়। মহেন্দ্র-বিনোদিনীকে আশালতা নতুন রূপে আবিষ্কার করে। রাজলক্ষ্মীর মনও বিনোদিনীর প্রতি বিষিয়ে ওঠে। বিনোদিনীও মহেন্দ্রের মধ্যে এক দায়িত্বজ্ঞানহীন মানুষকে প্রত্যক্ষ করে। তবু মহেন্দ্রের কাতর অনুনয়ের পরিপ্রেক্ষিতে এবং রাজলক্ষ্মীর প্রতি সাময়িক বিরূপতার কারণে বিনোদিনী অবশেষে মহেন্দ্রের সঙ্গে সংসারত্যাগের সিদ্ধান্ত নেয়।

৩৫ থেকে ৫১-সংখ্যক পরিচ্ছেদ হচ্ছে *চোখের বালি* উপন্যাসের চতুর্থ স্তর। এই স্তরে দেখা যায়, বিনোদিনী মহেন্দ্র-বিকেন্দ্রিক চেতনাস্রোতে আন্দোলিত হয়ে বর্ষণসিক্ত সন্ধ্যালোকে উপস্থিত হয় বিহারীর বাড়িতে। সমস্ত দ্বিধা-সংশয় ঝেড়ে ফেলে বিহারীর পদপ্রান্তে নিজেকে উৎসর্গ করে সে —

... একেবারে পাথরের দেবতার মতো পবিত্র হইয়ো না। মন্দকে ভালোবাসিয়া একটুখানি মন্দ হও।" ... "জীবনসর্বস্ব, জানি তুমি আমার চিরকালের নও, কিন্তু আজ এক মুহূর্তের জন্য আমাকে ভালোবাসো। তার পরে আমি আমাদের সেই বনে জঙ্গলে চলিয়া যাইব, কাহারো কাছে কিছুই চাহিব না। মরণ পর্যন্ত মনে রাখিবার মতো আমাকে একটা কিছু দাও। (পরিচ্ছেদ ৩৫)

অবশেষে নিস্পৃহচিত্ত বিহারীর নির্দেশিত বিধান মান্য করে বিনোদিনী ফিরে যায় বারাসতে, এবং দুঃখদাহযন্ত্রণাহীন প্রশান্তসুন্দর জীবনানুভবে সমর্পিত হয় সে। মনে মনে সে বলে—

বেশ হইয়াছে, ভালোই হইয়াছে, নিজেকে লইয়া আর টানাছেঁড়া করিতে পারি না; এবারে সমস্ত ভুলিব, ঘুমাইব— পাড়াগাঁয়ের মেয়ে হইয়া ঘরের ও পল্লীর কাজে কর্মে সন্তোষের সঙ্গে, আরামের সঙ্গে, জীবন কাটাইয়া দিব। (পরিচ্ছেদ ৩৮)

বারাসতের জীর্ণ, অপরিচ্ছন্ন ও মলিন গৃহপরিবেশে বিনোদিনী নিমগ্ন হয় বিহারীধ্যানে। যখন বিনোদিনীর দৈনন্দিন কর্মযাত্রা, সমাজ-সংসার, বিশ্বভুবন বিহারীভাবনায় একাকার তখন সেখানে নাটকীয়ভাবে উপস্থিত হয় মহেন্দ্র। সন্দেহপ্রবণ পল্লিবাসীদের শ্যেনদৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে মহেন্দ্রের সঙ্গে বিনোদিনী প্রত্যাবর্তন করে কলিকাতায়, এবং অবস্থান নেয় পটলডাঙার বাসায়। এ-পর্যায়েও বিনোদিনীর নির্ভরস্থল একান্তই সংকীর্ণ; বিহারীকেন্দ্রিক। মহেন্দ্রের সে আশ্রিতা, কিন্তু তার হৃদয়মন বিহারীমুখী। মহেন্দ্রের সঙ্গে তুলনা-প্রতিতুলনায় বিহারীই হয়ে ওঠে তার পরম-আরাধ্য ব্যক্তিত্ব —

বিহারী ছাড়া তাহার আর উপায় নাই। মহেন্দ্রকে বিনোদিনী খুব ভালো করিয়াই জানিয়াছে; তাহার উপরে নির্ভর করিতে গেলে সে ভর সয় না — তাহাকে ছাড়িয়া দিলে তবেই তাহাকে পাওয়া যায়, তাহাকে ধরিয়া থাকিলে সে ছুটিতে চায়। কিন্তু নারীর পক্ষে যে নিশ্চিত বিশ্বস্ত নিরাপদ নির্ভর একান্ত আবশ্যক বিহারীই তাহা দিতে পারে। আজ আর বিহারীকে ছাড়িলে বিনোদিনীর একেবারেই চলিবে না। (পরিচ্ছেদ ৪১)

বিনোদিনীর অব্যাহত বিরাগের পরিপ্রেক্ষিতে মহেন্দ্র তীব্র হাহাকারে বিদীর্ণ হয়ে উচ্চারণ করে :

নিষ্ঠুর! বিনোদ, তুমি নিষ্ঠুর! আমি অত্যন্ত হতভাগ্য যে, আমি তোমাকে ভালোবাসিয়াছি। (পরিচ্ছেদ ৪১)

কিন্তু যে বিহারীর জন্য বিনোদিনীর চিত্তলোক সতত উৎসুক, সে বিহারী তো স্পর্শাতীত। বিনোদিনীর পরিবর্তে সে এখন লোককল্যাণব্রতে উৎসর্গীকৃত। ফলত বিনোদিনী আপাতস্বস্তির প্রত্যাশায় মহেন্দ্রের সঙ্গে পশ্চিম ভারত ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ে। এখন সে কৃচ্ছ্রসাধনায় সমর্পিতচিত্ত, ত্যাগের মহিমায় উদ্বোধিত, শুদ্ধাচারী। বিনোদিনী প্রসঙ্গে মহেন্দ্রের দৃষ্টিকোণ-উৎসারিত মনোভাবনা লক্ষণীয় :

মহেন্দ্রের ঘরে যখন বিনোদিনী ছিল তখন তাহার আচরণে বৈধব্যব্রতের কাঠিন্য বড়ো-একটা ছিল না, কিন্তু এতদিন পরে সে আপনাকে সর্বপ্রকার ভোগ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। এখন সে এক বেলা খায়, মোটা কাপড় পরে, তাহার সেই অনর্গল-উৎসারিত হাস্যপরিহাসই বা গেল কোথায়। এখন সে এমন স্তব্ধ, এমন আবৃত, এমন সুদূর, এমন ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে যে,

> মহেন্দ্র তাহাকে সামান্য একটা কথাও জোর করিয়া বলিতে সাহস পায় না। মহেন্দ্র আশ্চর্য হইয়া, অধীর হইয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া কেবলই ভাবিতে লাগিল, 'বিনোদিনী আমাকে এত চেষ্টায় দুর্লভ ফলের মতো এত উচ্চশাখা হইতে পাড়িয়া লইল, তাহার পরে ঘ্রাণমাত্র না করিয়া আজ মাটিতে ফেলিয়া দিতেছে কেন।' (পরিচ্ছেদ ৫০)

পশ্চিমভারত পরিভ্রমণকালে এলাহাবাদ স্টেশনে স্থাপিত ডাকবাক্সে বিহারীলালের ঠিকানাযুক্ত পত্রের সূত্রে বিহারীর যমুনাতীরবর্তী নিবাসগৃহে উপস্থিত হয় বিনোদিনী, এবং রাত্রিদিন কায়মনে তপস্যা করতে থাকে বিহারীর।

চোখের বালি উপন্যাসের পঞ্চম স্তর ৫২ থেকে ৫৫-সংখ্যক পরিচ্ছেদ। এ-পর্যায়ে রাজলক্ষ্মীর অসুস্থতার পরিপ্রেক্ষিতে মহেন্দ্রকে স্বগৃহে ফিরিয়ে নেবার জন্যে এলাহাবাদের সেই গৃহে নাটকীয়ভাবে উপস্থিত হয় বিহারী। তাকে উদ্দেশ্য করে বিনোদিনী নিবেদন করে তার তপস্যাশুদ্ধ চিত্তের প্রণয়ার্ঘ্য। মহেন্দ্রের উৎকট ভর্ৎসনার জবাবে বিহারীর নির্দ্বন্দ্ব উচ্চারণ —

> মহেন্দ্র, বিনোদিনীকে আমি বিবাহ করিব, তোমাকে জানাইলাম; অতএব এখন হইতে সংযতভাবে কথা কও। (পরিচ্ছেদ ৫২)

বিহারীর এ-উক্তি বিনোদিনীর কাছে অভাবিতপূর্ব, আরোপিত, আকস্মিক, নাটকীয় ও পরিহাসতুল্য। বিহারী কি তবে বিনোদিনীর মতো পাপিষ্ঠাকে উদ্ধার করতে চায়! বিনোদিনীর সপ্রতিভ জিজ্ঞাসার প্রত্যুত্তরে বিহারীর অকপট উচ্চারণ —

> না। আমি তোমাকে ভালোবাসি বলিয়া, শ্রদ্ধা করি বলিয়া। (পরিচ্ছেদ ৫২)

বিহারীর এ-শ্রদ্ধান্বিত ভালোবাসাই বিনোদিনীর কাছে মহার্ঘ্যতুল্য। সে তাই পরম পরিতৃপ্ত। তার সংকীর্ণ-পরিসর জীবনে এর চেয়ে বেশিকিছু সে চায়নি। তাই বিহারীকে উদ্দেশ্য করে সে তার মীমাংসিত চিত্তলোক থেকে যেসব উক্তি-প্রত্যুক্তি নিবেদন করে তা লক্ষণীয় :

> ১. এই আমার শেষ পুরস্কার হইয়াছে। এই যেটুকু স্বীকার করিলে, ইহার বেশি আর আমি কিছুই চাই না। পাইলেও তাহা থাকিবে না, ধর্ম কখনো তাহা সহ্য করিবেন না। (পরিচ্ছেদ ৫২)
> ২. আমি বিধবা, আমি নিন্দিতা, সমস্ত সমাজের কাছে আমি তোমাকে লাঞ্ছিত করিব, এ কখনো হইতেই পারে না। ছি ছি, এ কথা তুমি মুখে আনিয়ো না। (পরিচ্ছেদ ৫২)
> ৩. ছি ছি, বিধবাকে তুমি বিবাহ করিবে! তোমার ঔদার্যে সব সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু আমি যদি এ কাজ করি, তোমাকে সমাজে নষ্ট করি, তবে ইহজীবনে আমি আর মাথা তুলিতে পারিব না। (পরিচ্ছেদ ৫২)
> ৪. পরজন্মে তোমাকে পাইবার জন্য আমি তপস্যা করিব– এ জন্মে আমার আর-কিছু আশা নাই, প্রাপ্য নাই। (পরিচ্ছেদ ৫২)

অতঃপর এক প্রশান্তগম্ভীর জীবনধর্মে সুস্থির হয়ে ওঠে বিনোদিনী। ভোগাকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিয়ে ত্যাগের মহিমায় উদ্বোধিত হয় সে; পুনর্জাত হয় লক্ষ্মী ও কল্যাণী সত্তায়। দীর্ঘদিনের টানাপড়েন আর চিত্তদাহনের মধ্য দিয়ে সে উন্নীত হয় শুদ্ধসত্তায়। ইন্দ্রিয়জ ভোগলালসা থেকে মুক্ত হয়ে সে অবশেষে অর্জন করে আনন্দময় জীবনের আস্বাদ। জীবনের বিচিত্র উত্থান-পতন, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির অঙ্ক মেলাতে গিয়ে সে পরিশেষে অনুধাবন করে—

> অধিকার লাভের যে মর্যাদা আছে সেই মর্যাদা রক্ষা করিতে হইলে অধিকার প্রয়োগকে সংযত করিতে হয়। যতটা পাওয়া যায় ততটা লইয়া টানাটানি করা কাঙালকেই শোভা পায় — ভোগকে খর্ব করিলেই সম্পদের যথার্থ গৌরব। (পরিচ্ছেদ ৫৩)

নিছক ক্ষণিকের আবেগ বা উচ্ছ্বাস থেকে নয়, বিনোদিনীর এ-দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ জাগরণ যে তার অকৃত্রিম জীবনোপলব্ধি থেকে উৎসারিত তা নিঃসন্দেহ। তার এ-পরিণাম উপন্যাসের ঘটনাধারার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ কি না তা নিয়ে বিস্তর বিতর্ক থাকলেও আমাদের মনে হয় — এর চেয়ে অন্য কোনো পরিণতি বিনোদিনীর জন্য সুসংগত হতো না। রবীন্দ্রনাথ বিনোদিনীর যে পরিণামী চিত্র অঙ্কন করেছেন তা যথার্থ। বিনোদিনীর জীবনপরিণাম অন্যরকমও হতে পারত, কিন্তু তা রবীন্দ্র-ভাবাদর্শের অনুকূল হতো না। তাই রবীন্দ্রনাথ যেখানে বিনোদিনীর কিংবা উপন্যাসের সমাপ্তি টেনেছেন সেখানেই তার নির্ধারিত সীমা।

চার

চোখের বালি সমাজ-সমস্যাশ্রয়ী নয়, ব্যক্তিত্বের সংকটমূলক উপন্যাস। এটি বাংলা সাহিত্যে চরিত্রপ্রধান উপন্যাসের ধারায় প্রথম উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। 'মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ-কুশলতা *চোখের বালি*র চরিত্রাঙ্কনের বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেকটি চরিত্রের পরিকল্পনায় ভিত্তিগত কোন গূঢ় গভীর সূত্র চরিত্রগুলিকে যেমন স্বাভাবিক তেমনি জীবন্ত করেছে। লেখক বিভিন্ন ঘটনাবর্ণনায়, মন্তব্য-বিশ্লেষণে চরিত্রগুলিকে বিকশিত করে সুস্পষ্ট রেখায় চিত্রিত করেছেন' (সত্যব্রত ১৯৭১ : ১৭৩)। প্রত্যেকটি চরিত্র হয়ে উঠেছে তাঁর মনোভাবের বাহন।

*চোখের বালি*র ঘটনাংশ প্রধানত বিনোদিনীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হলেও উপন্যাসের কেন্দ্রীয় ঘটনাধারার সঙ্গে মহেন্দ্র চরিত্রের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান। আশৈশব সে পিতৃহীন। ফলত সে মাতৃঘনিষ্ঠ ও মাতৃশাসিত। মায়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক নিবিড় ও ওতপ্রোত। কখনো কখনো এ-সম্পর্ক ন্যায্যতাবর্জিত। মহেন্দ্রের অন্তরঙ্গ বন্ধু বিহারী। 'স্টিমবোটের পশ্চাতে আবদ্ধ গাধাবোটের মতো' সে মহেন্দ্রকে নির্বিচারে সঙ্গ দিয়েছে সারাক্ষণ। মহেন্দ্রের স্বেচ্ছাচারের লাগাম তাই কেউই টেনে ধরেনি। আজন্ম অব্যাহত প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে সে বেড়ে উঠেছে; কখনো অপ্রাপ্তির যন্ত্রণা, প্রতিকূল বিপত্তি বা সংঘাত-সংঘর্ষের মুখোমুখি হয়নি সে। তাই সে অর্জন করেনি বাস্তবোপযোগী ব্যক্তিত্ববোধ। এ অপূর্ণতার কারণেই সে যেমন দ্বিধাহীন চিত্তে বিনোদিনীকে বিয়ে করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে, ঠিক তেমনি ঔচিত্যবোধবর্জিত হয়ে বিয়ে করেছে আশালতাকে।

বিবাহিত জীবনে আশালতাকে নিয়ে মহেন্দ্র মেতে ওঠে উদ্দাম প্রেমলীলায়। সংসারের দশকর্ম থেকে বিমুখ হয়ে সে হয়ে ওঠে উৎকট ভোগলিপ্সু। 'কালেজ, এক্‌জামিন, বন্ধুকৃত্য, সামাজিকতা' বর্জন করে সে স্ত্রীর উন্নতি সাধনে নিয়োজিত করে নিজেকে। এমতাবস্থায় তার প্রতি বিরূপতা প্রদর্শন করে মা রাজলক্ষ্মী চলে যান বারাসতে; পুণ্যার্জনের অজুহাতে কাকী অন্নপূর্ণা চলে যান তীর্থক্ষেত্রে। এই দুজনের অনুপস্থিতিতে শাসন-অনুশাসনের গ্রন্থি হয়ে যায় শিথিল; মহেন্দ্রের জীবন তাই হয়ে ওঠে নোঙরবিহীন নৌকোর মতো। কিন্তু বিরামহীন ভোগ অতিদ্রুত মহেন্দ্রের দেহে-মনে নিয়ে আসে ক্লান্তি, সংসারবিচ্ছিন্ন

দাম্পত্যপ্রেম পরিণত হয় শ্রীহীন অভ্যাসে। মহেন্দ্র-আশার এই ক্লান্তিকর দাম্পত্যজীবন-পরিসরে আত্মপ্রকাশ ঘটে বিনোদিনীর। আশালতার সরলচিত্ত অনুযোগ, ফোটোগ্রাফ-অভ্যাস, ওডিকলোন-সেবনের পরিপ্রেক্ষিতে মহেন্দ্র দাম্পত্যনীতিবোধ বিসর্জন দিয়ে একপর্যায়ে আক্রান্ত হয় বিনোদিনীমুখী ভাবনায়। দমদমের চড়িভাতির পর বিনোদিনীর মনোজগৎ ক্রমশ হয়ে ওঠে বিহারীমুখী; এবং তার ক্রমাগত উপেক্ষায় মহেন্দ্র হয়ে ওঠে ক্লিষ্ট, বিপন্ন ও বিপর্যস্ত। একদিকে দাম্পত্যধর্ম অন্যদিকে বিনোদিনীর প্রতি তীব্র প্রেমাবেগ মহেন্দ্রকে অবিরাম তৃপ্তির কূল থেকে অতৃপ্তির কূলে, এবং পূর্ণতার জগৎ থেকে অপূর্ণতার জগতে নিক্ষেপ করেছে। মনোজগতের দহনে-যন্ত্রণায় সে পীড়িত হয়েছে; বিনোদিনীর সঙ্গসুখের জন্য তীব্র কাতরতা প্রদর্শন করেছে। এর মধ্যে সে কোনো নীতিহীনতা প্রত্যক্ষ করেনি :

> বিনোদিনী আমাকে যদি মনে মনে ভালোবাসে, তাহা বিনোদিনীর পক্ষে মঙ্গলকর — এক জায়গায় সে বদ্ধ হইয়া থাকিবে। আমি নিজের মন জানি, আমি তো তাহার প্রতি কখনোই অন্যায় করিব না। সে আমাকে নিরাপদে ভালোবাসিতে পারে। আমি আশাকে ভালোবাসি, আমার দ্বারা তাহার কোনো ভয় নাই। কিন্তু সে যদি অন্য কোনো দিকে মন দেয়, তবে তাহার কী সর্বনাশ হইতে পারে কে জানে। (পরিচ্ছেদ ২৪)

মহেন্দ্রের এ-মনোভাবনা নিঃসন্দেহে মানুষী প্রবণতাজাত। এজন্য বিনোদিনীর প্রতি তীব্র আকর্ষণ সত্ত্বেও সে আশার প্রতি তার অন্তর্গত টান উপেক্ষা করতে পারে না। আশার কাশীবাসকালে বিনোদিনীকে নির্জন কক্ষান্তরে একা পেয়েও সে তাই আশার অদৃশ্য প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে না। বিনোদিনী-রচিত সৌগন্ধ্যবহ শয়নশয্যায় নিজেকে সমর্পণ করেও সে তাই 'এপাশ-ওপাশ করিতে লাগিল — কোথায় যেন পুরাতনের কোনো-একটা নিদর্শন খুঁজিয়া পাইয়া তাহা আঁকড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা।' আবার আশা কাশী থেকে কলকাতা প্রত্যাবর্তন করলে আশার প্রতি সে প্রদর্শন করে বিরূপতা এবং বিনোদিনীকে নিয়ে সে সংসারক্ষেত্র থেকে নিরুদ্দিষ্ট হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। বিনোদিনীর জন্য সে হন্যে হয়ে বারাসতে যায়, গ্রামের অমার্জিত ও অসংস্কৃত মানুষের কাছে সে তার অহংবোধ বিসর্জন দেয় এবং বিনোদিনীর কল্যাণ-প্রত্যাশায় তাকে নিয়ে আসে কলকাতায়। এ-পর্যায়েও বিহারীমুখী বিনোদিনী তাকে বিচিত্র অজুহাতে প্রত্যাখ্যান করে। তবুও মনোদৈহিক স্বস্তিসন্ধান এবং বিনোদিনীকে অর্জনের অন্তর্গত আকাঙ্ক্ষায় মহেন্দ্র তাকে নিয়ে পশ্চিম ভারত পরিভ্রমণে বেরিয়ে পড়ে। তবুও জীবনধর্মে সে বিনোদিনীকে অর্জনে ব্যর্থ হয়। এতৎসত্ত্বেও বিনোদিনীর ওপর সে জবরদস্তি করেনি; প্রয়োগ করেনি আসুরিক শক্তি, বিসর্জন দেয়নি মানবীয় বিচার-বিবেচনাবোধ। সহায়-সম্বলহীন বিনোদিনীকে যে আশ্রয় সে দিয়েছে তার অমর্যাদা সে করেনি। এখানেই মহেন্দ্র চরিত্রের ঔদার্য ও মহানুভবতা। এলাহাবাদের অচেনা পরিবেশে বিনোদিনীর সঙ্গে তার যে কথোপকথন তা এতৎপ্রসঙ্গে বিবেচনাযোগ্য :

> মহেন্দ্র । তুমি আমাকে ভয় কর না কেন, এখানে তোমার রক্ষক কে আছে।
> বিনোদিনী। তুমি আমার রক্ষক আছ। তোমার নিজের কাছ হইতে তুমি আমাকে রক্ষা করিবে।

মহেন্দ্র । এইটুকু শ্রদ্ধা, এইটুকু বিশ্বাস, এখনো বাকি আছে !
বিনোদিনী । তা না হইলে আমি আত্মহত্যা করিয়া মরিতাম, তোমার সঙ্গে বাহির হইতাম না। (পরিচ্ছেদ ৫১)

মহেন্দ্রের প্রতি এই অবিচলিত আস্থা সত্ত্বেও বিনোদিনীর প্রেম বিহারীকেন্দ্রিক। বিনোদিনী মহেন্দ্রের আশ্রিতা হয়েও অন্তস্তলে লালন করেছে বিহারীকে, তাকে নিবেদন করেছে প্রেমের বরমাল্য। এমতাবস্থায় বিনোদিনীকে উদ্দেশ্য করে মহেন্দ্রের যন্ত্রণাদীর্ণ অন্তরাত্মার তীব্র হাহাকার :

যতদিন তুমি না মরিবে ততদিন আমার প্রত্যাশাও মরিবে না, আমি নিষ্কৃতি পাইব না। আমি আজ হইতে ভগবানের কাছে সর্বান্তঃকরণে তোমার মৃত্যু কামনা করি। তুমি আমারও হইয়ো না, তুমি বিহারীরও হইয়ো না। তুমি যাও। আমাকে ছুটি দাও। (পরিচ্ছেদ ৫১)

এমতাবস্থায় মহেন্দ্রের মোহমুক্তির পালা শুরু হয়। সে নবতর উপলব্ধিতে জাগ্রত হতে শুরু করে। বিনোদিনীকে নিয়ে সে সমর্পিত হয় বিপ্রতীপ ভাবনায়। তার এতদ্বিষয়ক অন্তর্ভাবনার স্বরূপ অনুধাবনীয় —

১. 'আমি সর্বাংশেই বিনোদিনীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তবু আজ আমি সর্বপ্রকার হীনতা ও লাঞ্ছনা স্বীকার করিয়া ঘৃণিত ভিক্ষুকের মতো তাহার পশ্চাতে অহোরাত্র ছুটিয়া বেড়াইতেছি; এমনতরো অদ্ভুত পাগলামি কোন্ শয়তান আমার মাথার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছে।' (পরিচ্ছেদ ৫২)
২. 'যাহা যথার্থ গভীর এবং স্থায়ী তাহার মধ্যে বিনা চেষ্টায়, বিনা বাধায় আপনাকে সম্পূর্ণ নিমগ্ন করিয়া রাখা যায় বলিয়া তাহার গৌরব আমরা বুঝিতে পারি না; যাহা চঞ্চল ছলনামাত্র, যাহার পরিতৃপ্তিতেও লেশমাত্র সুখ নাই, তাহা আমাদিগকে পশ্চাতে ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়দৌড় করাইয়া বেড়ায় বলিয়াই তাহাকেই চরম কামনার ধন বলিয়া মনে করি।' (পরিচ্ছেদ ৫২)
৩. 'আজই বাড়ি ফিরিয়া যাইব; বিনোদিনী যেখানেই থাকিতে চাহে সেইখানেই তাহাকে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আমি মুক্ত হইব। (পরিচ্ছেদ ৫২)
৪. এই সামান্য এক স্ত্রীলোকের কাছে আমি নিজেকে এতই হীন করিয়াছি যে, আমাকে যখন-তখন এমনতরো অবজ্ঞাভরে দূর করিয়া দিবার অধিকার ইহার জন্মিয়াছে। সে অধিকার ইহার স্বাভাবিক অধিকার নহে। আমিই তাই ইহাকে দিয়া ইহার গর্ব এমন অন্যায়রূপে বাড়াইয়া দিয়াছি।' এই লাঞ্ছনার পরে মহেন্দ্র নিজের মধ্যে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করিবার চেষ্টা করিল। সে কহিল, 'আমি জয়ী হইব; ইহার বন্ধন আমি ছেদন করিয়া দিয়া চলিয়া যাইব।' (পরিচ্ছেদ ৫২)

আজন্ম অবাধ-প্রাপ্তির মধ্যে বেড়ে-ওঠা মহেন্দ্র চরিত্রের এসব ভাবনা আকস্মিক বলে মনে হয় না। তার মনোগঠনের মধ্যেই উপ্ত রয়েছে এ-ভাবনাবীজ। এতদিন সে ছিল আকাশচারী। বিনোদিনী ঘা দিয়ে তার আত্মম্ভরিতার ফাঁপা বেলুন ফুটো করে দিয়েছে, আর মহেন্দ্র পা রেখেছে বাস্তব-জমিনে। রাজলক্ষ্মীর অযৌক্তিক অতিপ্রশ্রয়ে মহেন্দ্রের মধ্যে এ-ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, জীবনে অপ্রাপ্তি বলে কিছু নেই, সংসারে যা-কিছু দুর্লভ ও মহার্ঘ্য তা একান্তরূপে তারই ভোগ্য, এবং এসব ক্ষেত্রে নীতিবোধের কোনো বালাই নেই। বিহারীর সঙ্গে অনাকাঙ্ক্ষিত দূরত্ব এবং বিনোদিনীর প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়ে মহেন্দ্র চরিত্রে

এসেছে দুর্লভ সম্পূর্ণতা। অন্তর্জাগতিক প্রেমপ্রত্যাশা এবং প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির দোলাচলে বেড়ে-ওঠা মহেন্দ্র চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথের বিস্ময়কর সৃষ্টি।

চোখের বালি উপন্যাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র বিহারী। মহেন্দ্রের সঙ্গে তার সম্পর্ক 'স্টীমবোটের পশ্চাতে আবদ্ধ গাধাবোটের মতো', 'একটি আবশ্যক ভারবহ আসবাবের স্বরূপ'। রাজলক্ষ্মী-অন্নপূর্ণার সঙ্গে তার সম্পর্ক ভাবাবেগের, যুক্তিহীন বিশ্বাসের। এ যুক্তিহীন ভক্তি-বিশ্বাস যে মুক্তি আনে না বরং জীবনকে করে তোলে বিষময় তা বিহারীর জীবনপরিণামসূত্রে উপলব্ধি করা যায় চমৎকারভাবে। ভাবাবেগে আন্দোলিত হয়ে সে মহেন্দ্রের অসংগত ইচ্ছার কাছে বিসর্জন দিয়েছে আশালতাকে। বিনোদিনীর আবেগঘন প্রণয়-নিবেদনের পূর্ব পর্যন্ত আশালতার প্রতি সে লালন করেছে গোপন প্রণয়। বিনোদিনীর প্রতি বরাবরই সে প্রদর্শন করেছে নিস্পৃহতা; কোনো কার্যকর প্রণয়াবেগে শেষাবধি সে জেগে ওঠেনি।

বারাসতের গ্রামীণ পরিবেশে বিনোদিনীর সঙ্গে বিহারীর পরিচয় ঘটলেও বিনোদিনী সম্পর্কে বিহারীর কৌতূহল উদ্রিক্ত হতে শুরু করে উপন্যাসের ১২-সংখ্যক পরিচ্ছেদ থেকে। মহেন্দ্র-আশার সংসারে বিনোদিনীর আবির্ভাব 'বিষবৃক্ষে'র কুন্দনন্দিনীর মতো কি না — মহেন্দ্র-বিহারীর এরকম বিতর্কের এক পর্যায়ে বিনোদিনীর প্রতি সমবেদনায় জাগ্রত হয়ে বিহারী বলে যে —

> ... বিনোদিনীর কথা আমি মাঝে মাঝে ভাবি। তোমার এখানে উনি তো চিরদিন থাকিতে পারেন না। তাহার পরে, যে বন দেখিয়া আসিয়াছি সেখানে উহাকে যাবজ্জীবন বনবাসে পাঠানো, সেও বড়ো কঠিন দণ্ড। (পরিচ্ছেদ ১২)

বিনোদিনীর ব্যক্তিত্ববোধও এ-পর্যায়ে পরিচিহ্নিত হয়েছে বিহারীর মনোভাবনার মাধ্যমে—

> এ নারী জঙ্গলে ফেলিয়া রাখিবার নহে। কিন্তু শিখা এক ভাবে ঘরের প্রদীপরূপে জ্বলে, আর-এক ভাবে ঘরে আগুন ধরাইয়া দেয় — সে আশঙ্কাও বিহারীর মনে ছিল।...কিন্তু তাহার মন বুঝিয়াছিল, এ নারী খেলা করিবার নহে, ইহাকে উপেক্ষা করাও যায় না। (পরিচ্ছেদ ১২)

স্পষ্টত বিনোদিনীর মধ্যে বিহারী প্রত্যক্ষ করেছে নারীর দ্বৈতরূপ; কল্যাণী-অকল্যাণী আর লক্ষ্মী-অলক্ষ্মী সত্তার মিলিত সমবায়ে গড়ে উঠেছে তার সত্তাস্বরূপ। বিনোদিনী প্রসঙ্গে বিহারীর এ-মনোভাবনা পরিবর্তিত হয় ১৭-সংখ্যক পরিচ্ছেদে, দমদমের চড়িভাতিকে উপলক্ষ করে। সে বিনোদিনীর মধ্যে প্রত্যক্ষ করে এক কল্যাণময়ী লক্ষ্মীসত্তাকে :

> বিনোদিনী সলজ্জ সতীস্ত্রীভাবে একান্ত-ভক্তিভরে পতিসেবা করিতেছে, কল্যাণপরিপূর্ণা জননীর মতো সন্তানকে কোলে ধরিয়া আছে, এ ছবি ইতিপূর্বে মুহূর্তের জন্যও বিহারীর মনে উদিত হয় নাই — আজ যেন রঙ্গমঞ্চের পটখানা ক্ষণকালের জন্য উড়িয়া গিয়া ঘরের ভিতরকার একটি মঙ্গলদৃশ্য তাহার চোখে পড়িল। বিহারী ভাবিল, 'বিনোদিনী বাহিরে বিলাসিনী যুবতী বটে, কিন্তু তাহার অন্তরে একটি পূজারতা নারী নিরশনে তপস্যা করিতেছে।' (পরিচ্ছেদ ১৭)

অতঃপর মহেন্দ্রের সংসারে ইতিবাচক ভূমিকার জন্য, কখনও বা আশালতার সঙ্গে তার সহানুভূতিশীল আচরণের জন্য বিনোদিনী প্রসঙ্গে বিহারীচিত্তের যে অনুভূতি তা

বিবেচনাসাপেক্ষে বলা যায় — বিহারী চরিত্রাঙ্কনে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন পূর্বাপর মীমাংসিত ও সতর্ক। রবীন্দ্রনাথ যে বিনোদিনীর সঙ্গে বিহারীর মানবীয় উত্তাপস্পন্দিত প্রেমসম্পর্ক অথবা দাম্পত্যসম্পর্ক অনুমোদন করতে চাননি তা বোঝা যায় বিনোদিনী প্রসঙ্গে বিহারীর বক্তব্য ও অন্তর্ভাবনাসূত্রে —

১. 'বিনোদিনীকে ভারি ভুল বুঝিয়াছিলাম। সেবায়, সান্ত্বনায়, নিঃস্বার্থ সখীপ্রেমে সে মর্তবাসিনী দেবী।' (পরিচ্ছেদ ১৯)

২. তুমি দেবী — ... আমি তোমাকে প্রথমে চিনি নাই, সেজন্য আমাকে ক্ষমা করো। ...তোমার দেবী-হৃদয়ের পরিচয় আমি পাইয়াছি — তোমার উপর আমার গভীর ভক্তি জন্মিয়াছে বলিয়াই, আজ তোমার কাছে আমার সমস্ত অপরাধ স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। (পরিচ্ছেদ ২২)

৩. "...তুমি দেবী, তুমি যাহা ভালো বোধ কর, তাহাই করিয়ো। আমি চলিলাম।" (পরিচ্ছেদ ২৩)

অথচ বিহারীর কাছে বিনোদিনী ভক্তের পূজা নয়, রক্তমাংসময় মানুষের আচরণই প্রত্যাশা করে। ৩৫-সংখ্যক পরিচ্ছেদে বিনোদিনী মহেন্দ্রের সঙ্গে সংসারত্যাগের সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করলে বিহারী আশালতার প্রতি সমবেদনায় জাগ্রত হয়ে তাকে নিবৃত্ত করে। প্রত্যুত্তরে বিনোদিনী বলে যে —

... তোমার আশার ভালো হউক, মহেন্দ্রের সংসারের ভালো হউক, এই বলিয়া ইহকালের আমার সকল দাবি মুছিয়া ফেলিব, এত ভালো আমি নই — ধর্মশাস্ত্রের পুঁথি এত করিয়া আমি পড়ি নাই। আমি যাহা ছাড়িব তাহার বদলে আমি কী পাইব। (পরিচ্ছেদ ৩৫)

বিনোদিনীর জীবনমুখী এ-আকুতির প্রত্যুত্তরে বিহারীর বক্তব্য ন্যায়ধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশংসনীয় হলেও মানবধর্মের বিচারে অনাকাঙ্ক্ষিত। বিনোদিনীর মনের পাঠ অনুধাবনে বিহারী ব্যর্থ। সে বরং বিনোদিনীর বক্তব্যের মধ্যে আবিষ্কার করেছে কৃত্রিম প্রগলভতা—

"... তুমি আজ যে কাণ্ডটা করিলে এবং যে কথাগুলা বলিতেছ, ইহার অধিকাংশই তুমি যে সাহিত্য পড়িয়াছ তাহা হইতে চুরি। ইহার বারো-আনাই নাটক এবং নভেল।"... তাও খুব উঁচুদরের নয়। তুমি মনে করিতেছ, এ সমস্ত তোমার নিজের — তাহা নহে। এ-সবই ছাপাখানার প্রতিধ্বনি। যদি তুমি নিতান্ত নির্বোধ মূর্খ সরলা বালিকা হইতে, তাহা হইলেও সংসারে ভালোবাসা হইতে বঞ্চিত হইতে না — কিন্তু নাটকের নায়িকা স্টেজের উপরেই শোভা পায়, ঘরে তাহাকে লইয়া চলে না। (পরিচ্ছেদ ৩৫)

এমতাবস্থায় বিনোদিনী তার সমস্ত অভিমান, আত্মসম্মান, তেজ, দুঃসহ দর্প বিসর্জন দিয়ে মন্ত্রাহত ফণিনীর মতো বিহারীর পদতলে নিজেকে সমর্পণ করে এবং আকুল হাহাকারে বলে ওঠে :

১. "...একেবারে পাথরের দেবতার মতো পবিত্র হইয়ো না। মন্দকে ভালোবাসিয়া একটুখানি মন্দ হও।"...(পরিচ্ছেদ ৩৫)

২. "জীবনসর্বস্ব, জানি তুমি আমার চিরকালের নও, কিন্তু আজ এক মুহূর্তের জন্য আমাকে ভালোবাসো। তার পরে আমি আমাদের সেই বনে জঙ্গলে চলিয়া যাইব, কাহারো কাছে কিছুই চাহিব না। মরণ পর্যন্ত মনে রাখিবার মতো আমাকে একটা কিছু দাও।" বলিয়া বিনোদিনী চোখ বুজিয়া তাহার ওষ্ঠাধর বিহারীর কাছে অগ্রসর করিয়া দিল। (পরিচ্ছেদ ৩৫)

কিন্তু বিহারীকর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েও বিহারীর বিধান মান্য করে বিনোদিনী তৃষিত চিত্তে বারাসতে চলে যায়। বিহারী সমর্পিত হয় আত্মমগ্ন অবসাদগ্রস্ততায়। তার মনে হয়, যে-বিনোদিনী সংসারের সামূহিক অশান্তির কারণ তাকে ভালোবাসা যায় না, ঘৃণাই তার প্রাপ্য। কিন্তু তাকে ঘৃণা করাও অসম্ভব। কারণ বিহারীর মনোজগতে বিনোদিনীরই যে প্রবল অধিষ্ঠান —

> বিহারী চক্ষু বুজিয়া সেই কল্পমূর্তিকে স্মৃতিলোক হইতে নির্বাসিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু কোনোমতেই তাহাকে আঘাত করিতে যেন তাহার হাত উঠিলনা — একটি অসম্পূর্ণ ব্যাকুল চুম্বন তাহার মুখের কাছে আসন্ন হইয়া রহিল, পুলকে তাহাকে আবিষ্ট করিয়া তুলিল। ... যে মুহূর্তে বিহারী তাহার সমস্ত জীবনের সমস্ত প্রেমের দাবি হইতে বঞ্চিত হইয়া একেবারে নিঃস্ব ভিখারির মতো পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, সেই মুহূর্তে বিহারী কি এমন অযাচিত অজস্র প্রেমের উপহার সমস্ত হৃদয়ের সহিত উপেক্ষা করিয়া ফেলিয়া দিতে পারে। ইহার তুলনায় বিহারী কী পাইয়াছে। এতদিন পর্যন্ত সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়া সে কেবল প্রেমভাণ্ডারের খুদকুঁড়া ভিক্ষা করিতেছিল। প্রেমের অন্নপূর্ণা সোনার থালা ভরিয়া আজ একা তারই জন্য যে ভোজ পাঠাইয়াছেন, হতভাগ্য কিসের দ্বিধায় তাহা হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিবে। (পরিচ্ছেদ ৩৭)

অতঃপর পশ্চিমভারত পরিভ্রমণ, অল্পাশী পরিবারভারগ্রস্ত কেরানিকুলের চিকিৎসা ও শুশ্রূষাভার গ্রহণের মাধ্যমে বিহারী নির্ভার হওয়ার চেষ্টা করলেও বিনোদিনীর স্মৃতি সে বিস্মৃত হতে পারেনি; মনে হয় জীবন বড়ো বেশি অপচয়ের খাতে বয়ে গেছে। বিনোদিনীর সেদিনের সেই উদ্যত ও অসম্পূর্ণ চুম্বন যে রোমান্টিক ভাবাবহ নির্মাণ করেছিল, তার সঙ্গে তুলনা-প্রতিতুলনায় সবকিছু মনে হচ্ছিল তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর —

> পূর্বের যে জীবনটা তাহার সুখে সন্তোষে কাটিয়া গেছে, আজ বিহারী সেই জীবনটাকে পরম ক্ষতি বলিয়া মনে করিতেছে। এমন কত মেঘের সন্ধ্যা, এমন কত পূর্ণিমার রাত্রি আসিয়াছিল, তাহারা বিহারীর শূন্য হৃদয়ের দ্বারের কাছে আসিয়া সুধাপাত্রহস্তে নিঃশব্দে ফিরিয়া গেছে — সেই দুর্লভ শুভক্ষণে কত সংগীত অনারব্ধ, কত উৎসব অসম্পন্ন হইয়াছে, তাহার আর শেষ নাই। বিহারীর মনে যে-সকল পূর্বস্মৃতি ছিল বিনোদিনী সেদিনকার উদ্যত চুম্বনের রক্তিম আভার দ্বারা সেগুলিকে আজ এমন বিবর্ণ অকিঞ্চিৎকর করিয়া দিয়া গেল। ... প্রেমের বেদনায় সমস্ত জল-স্থল-আকাশের কেন্দ্রকুহর হইতে যে এমন রাগিণীতে এমন বাঁশি বাজে, তাহা তো অচেতন বিহারী পূর্বে কখনো অনুমান করিতেও পারে নাই। (পরিচ্ছেদ ৪৮)

কিন্তু এ-সুখস্বপ্নজাল ছিন্ন হয়ে যায় যখন সে অন্নপূর্ণার মাধ্যমে বিনোদিনী-মহেন্দ্রের পশ্চিমে পলায়নের বার্তা শ্রবণ করে। বিনোদিনীর প্রতি প্রেমজ আকর্ষণের মধ্যে সে তাই এক ধরনের মূঢ়তাকে প্রত্যক্ষ করে। অকস্মাৎ এক ছলনাময়ী নারীর স্বরূপে সে আবিষ্কার করে বিনোদিনীকে :

> বিহারীর চক্ষে তৎক্ষণাৎ জল-স্থল-আকাশের সমস্ত রঙ বদলাইয়া গেল, তাহার কল্পনাভাণ্ডারের সমস্ত সঞ্চিত রস মুহূর্তে তিক্ত হইয়া উঠিল। — 'মায়াবিনী বিনোদিনী কি সেদিনকার সন্ধ্যাবেলায় আমাকে লইয়া খেলা করিয়া গেল। তাহার ভালোবাসার আত্মসমর্পণ সমস্তই ছলনা ! সে তাহার গ্রাম ত্যাগ করিয়া নির্লজ্জভাবে মহেন্দ্রের সঙ্গে একাকিনী পশ্চিমে চলিয়া গেল। ধিক্ তাহাকে এবং ধিক্ আমাকে যে আমি মূঢ়, তাহাকে এক মুহূর্তের জন্যও বিশ্বাস করিয়াছিলাম।' (পরিচ্ছেদ ৪৮)

বিনোদিনী প্রসঙ্গে বিহারীর এ-নেতিচেতনার পরিপ্রেক্ষিতে রাজলক্ষ্মীর অসুস্থতার সংবাদ নিয়ে বিহারী মহেন্দ্রের সন্ধানে উপস্থিত হয় এলাহাবাদে। এখানে যমুনাতীরবর্তী গৃহাশ্রমে বিনোদিনীর কাছ থেকে পূর্বাপর সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করে বিহারী। তার প্রতি বিনোদিনীর হার্দিক আকর্ষণ ও একাগ্র আনুগত্যের কথা জানতে পেরে সে অকস্মাৎ প্রবল কর্তব্যবোধে জেগে ওঠে, এবং বিনোদিনীকে উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ করার সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করে। তপস্যাশুদ্ধ বিনোদিনী প্রত্যাখ্যান করে বিহারীর এই প্রস্তাব। কিন্তু বিনোদিনীর প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও বিহারীর মধ্যে কোনো ভাবাবেগ অথবা বঞ্চনাজনিত দাহ তৈরি হয় না। এভাবে উপর্যুপরি সন্দেহ আর বিশ্বাস, বিশ্বাস আর সন্দেহের দোলাচলে দুলতে দুলতে পরম নিবৃত্তির সন্ধান পায় বিহারী, এবং নির্দ্বন্দ্ব চৈতন্যলোকে সুস্থির হয়ে ওঠে। বিহারীর এ-পরিণাম যেন পাটিগণিতের সরলাঙ্কিক সমাধানের মতোই —

> বিহারী কহিল, "বোঠান, আমি অনেক ভাবিয়াছি। নানান হাঙ্গামে আমাদের জীবনের জালে অনেক জট পড়িয়া গেছে। এখন নিভৃতে বসিয়া বসিয়া তাহারই একটি একটি গ্রন্থি মোচন করিবার দিন আসিয়াছে। পূর্বে সমস্ত পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে। এখন হৃদয় যাহা চায় তাহাকে আর প্রশ্রয় দিতে সাহস হয় না। এ পর্যন্ত যাহা কিছু ঘটিয়াছে, যাহা কিছু সহ্য করিয়াছি, তাহার সমস্ত আবর্তন, সমস্ত আন্দোলন শান্ত করিতে না পারিলে জীবনের সমাপ্তির জন্য প্রস্তুত হইতে পারিব না। যদি সমস্ত অতীতকাল অনুকূল হইত তবে সংসারে একমাত্র তোমার দ্বারাই আমার জীবন সম্পূর্ণ হইতে পারিত — এখন তোমা হইতে আমাকে বঞ্চিত হইতেই হইবে। এখন আর সুখের জন্য চেষ্টা বৃথা, এখন কেবল আস্তে আস্তে সমস্ত ভাঙচুর সারিয়া লইতে হইবে। (পরিচ্ছেদ ৫৫)

বিহারীর এই উচ্চারণ শোক-তাপ-মোহমুক্ত অমৃতলোকবাসীর; মর্ত্যলোকবাসী মানুষের নয়। এই নির্দ্বন্দ্ব জীবনপরিণাম নৈতিকতার মানদণ্ডে প্রশংসনীয় হতে পারে; কিন্তু জীবন ও শিল্পের বিচারে বিকল ও খণ্ডিত ব্যক্তিত্ব হিসেবেই তাকে প্রতিষ্ঠিত করে।

চোখের বালি উপন্যাসের ঘটনাংশের ক্রমবিকাশে রাজলক্ষ্মী চরিত্রটি গুরুত্বপূর্ণ। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলেছেন —

> চোখের বালির গল্পকে ভিতর থেকে ধাক্কা দিয়ে দারুণ করে তুলেছে মায়ের ঈর্ষা। এই ঈর্ষা মহেন্দ্রের সেই রিপুকে কুৎসিত অবকাশ দিয়েছে যা সহজ অবস্থায় এমন করে দাঁত-নখ বের করত না। যেন পশুশালার দরজা খুলে দেওয়া হল, বেরিয়ে পড়ল হিংস্র ঘটনাগুলো অসংযত হয়ে। (সূচনা : *চোখের বালি*)

রবীন্দ্রনাথ-কথিত এ-মন্তব্য নিয়ে সমালোচকদের মধ্যে রয়েছে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ আকরম হোসেন প্রমুখ বিদগ্ধ গবেষক-সমালোচক এ-প্রসঙ্গে পোষণ করেছেন ভিন্নমত। তাঁদের বিশেষজ্ঞ-মন্তব্যের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করে বলা যায় — উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণে রাজলক্ষ্মীর ভূমিকা নিঃসন্দেহে ক্রিয়াশীল। মহেন্দ্রের বিবাহ প্রসঙ্গে অন্নপূর্ণার মন্তব্যসূত্রে রাজলক্ষ্মীর বক্তব্য, এবং অতঃপর ঘটনাধারার ক্রমপরম্পরায় সংঘটিত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াসূত্রে এ-কথা নিঃসন্দেহ যে, *চোখের বালি*র ঘটনাংশে দ্বন্দ্বাত্মক গতিসঞ্চারে রাজলক্ষ্মীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। উপন্যাসের প্রথম পর্যায়ে রাজলক্ষ্মীর ঈর্ষাবিষ

প্রযুক্ত হয়েছে তাঁর জা অন্নপূর্ণার ওপর; অতঃপর কখনো মহেন্দ্রকে উপলক্ষ করে, আবার কখনো বা আশালতা প্রসঙ্গে। প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতিসমূহ লক্ষণীয় :

১. "আমার ছেলে যদি অন্যের ছেলেদের চেয়ে মাকে বেশি ভালোবাসে, তোমার তাতে লজ্জা করে কেন মেজোবউ।। ছেলে থাকিলে ছেলের মর্ম বুঝিতে।"
রাজলক্ষ্মী মনে করিলেন, পুত্র সৌভাগ্যবতীকে পুত্রহীনা ঈর্ষা করিতেছে। (পরিচ্ছেদ ১)
২. "কী গো মেজোঠাকরুন, ছেলের কাছে লাগালাগি করিতেছিলে বুঝি ?" (পরিচ্ছেদ ১)
৩. "বাপ-মা-মরা অলক্ষণা কন্যার সহিত আমার এক ছেলের বিবাহ দিয়া তুমি আমার ছেলেকে আমার কাছ হইতে ভাঙাইয়া লইতে চাও ? এতবড়ো শয়তানি !" (পরিচ্ছেদ ৩)
৪. রাজলক্ষ্মী ধনুষ্টংকারের মতো বাজিয়া উঠিলেন, "আমার বউ! তুমি মন্ত্রী থাকিতে সে আমাকে গ্রাহ্য করিবে !" (পরিচ্ছেদ ৫)
৫. 'অন্নপূর্ণার গৃহত্যাগে এবং আমার গৃহত্যাগে প্রভেদ আছে — সে হইল মন্ত্র-জানা ডাইনি; আর আমি হইলাম শুদ্ধমাত্র মা; আমার যাওয়াই ভালো।' (পরিচ্ছেদ ৬)

একথা সত্যি যে, অন্নপূর্ণার প্রতি ঈর্ষাতুর হয়েই আশালতার প্রতি রাজলক্ষ্মী পোষণ করেছেন বিদ্বেষভাব। একই কারণে আশাকে পুত্রবধূর স্বীকৃতি ও মর্যাদাদানে তিনি করেছেন সংকোচবোধ। মহেন্দ্র-আশার দাম্পত্যসম্পর্ক মূল্যায়নেও তাঁর দৃষ্টি ছিল খণ্ডিত, একপেশে ও সনাতন মূল্যবোধ-আক্রান্ত। মহেন্দ্রের প্রতি তাঁর অযৌক্তিক অধিকারপ্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়ে একপর্যায়ে অভিমানাহত রাজলক্ষ্মী চলে যান বারাসতে; নির্ভরশীল হয়ে ওঠেন বিনোদিনীর ওপর। এই নির্ভরশীলতার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বিনোদিনীকে নিয়ে আসেন কলকাতায়, এবং বপন করেন নবতর বিভ্রাট-বীজ। অতঃপর মহেন্দ্র-আশার দাম্পত্যজীবনে বিনোদিনীকে কেন্দ্র করে যে ঝড় ওঠে তা নিয়ন্ত্রণের সাধ্য রাজলক্ষ্মীর ছিল না। এ-ঝড়ের কার্যকারণ নিঃসন্দেহে রাজলক্ষ্মীর চেতন-অবচেতন মনের ঈর্ষা; যার পরিণাম রাজলক্ষ্মীরও ছিল অজানা। উপন্যাসের ৩৪-সংখ্যক পরিচ্ছেদে রাজলক্ষ্মীকে উদ্দেশ্য করে বিনোদিনী যে উক্তি করেছে তাতে এ-বক্তব্য পেয়েছে উজ্জ্বল স্পষ্টতা —

...তুমি কি কখনো তোমার বউয়ের উপর দ্বেষ করিয়া এই মায়াবিনীকে দিয়া তোমার ছেলের মন ভুলাইতে চাও নাই। একবার ঠাওর করিয়া দেখো দেখি।"...বিনোদিনী অবিচলিত ভাবে কহিল, "পিসিমা, আমরা মায়াবিনীর জাত, আমার মধ্যে কী মায়া ছিল তাহা আমি ঠিক জানি নাই, তুমি জানিয়াছ; তোমার মধ্যেও কী মায়া ছিল তাহা তুমি ঠিক জান নাই, আমি জানিয়াছি। কিন্তু মায়া ছিল, নহিলে এমন ঘটনা ঘটিত না। ফাঁদ আমিও কতকটা জানিয়া এবং কতকটা না জানিয়া পাতিয়াছি। ফাঁদ তুমিও কতকটা জানিয়া এবং কতকটা না জানিয়া পাতিয়াছ। আমাদের জাতের ধর্ম এইরূপ — আমরা মায়াবিনী।

রাজলক্ষ্মী তাঁর চেতন-অবচেতন সত্তায় যে ঈর্ষাবাণ নিক্ষেপ করেছেন তা সংবরণের সাধ্য এক পর্যায়ে তাঁর ছিল না। ক্রমশ সবকিছুই চলে গেছে তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে। অবশ্য *চোখের বালির* ঘটনাংশকে দারুণ ও উপভোগ্য করে তুলেছে একমাত্র মায়ের ঈর্ষা — একথা রবীন্দ্রনাথ বলেননি। এক্ষেত্রে নানা অনুষঙ্গ-প্রসঙ্গ পালন করেছে কার্যকর ও সহায়ক ভূমিকা। মহেন্দ্রের অপরিণামদর্শী আচরণ, সংসারধর্মে আশার অনভিজ্ঞতা, বিনোদিনীর সপ্রাণ উপস্থিতি, বিহারীর শৈত্যস্বভাব প্রভৃতির মিলিত সমবায়ে উপন্যাসে নির্মিত হয়েছে

আবেগময় পরিপ্রেক্ষিত; কিন্তু রাজলক্ষ্মীর ঈর্ষাবিষ সবকিছু ছাপিয়ে উপন্যাসটিকে করে তুলেছে দ্বন্দ্বজটিল, উপভোগ্য ও আকর্ষণীয়।

চোখের বালি উপন্যাসের আশালতা সহজ-সরল-অজটিল চরিত্র। পিতৃমাতৃহীন আশা আশৈশব বেড়ে উঠেছে তার জেঠা অনুকূলবাবুর আশ্রয়ে। অন্যের সংসারে আশ্রিতা ও প্রতিপালিতা বলেই বিকশিত হয়নি তার দেহমন, পরিস্ফুটিত হয়নি ব্যক্তিত্ববোধ। ঔপন্যাসিকের ভাষ্য :

> কেহ তাহার বয়স স্পষ্ট করিয়া বলিত না। আত্মীয়েরা বলিত, 'এই বারো-তেরো হইবে।' অর্থাৎ চোদ্দ-পনেরো হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। কিন্তু অনুগ্রহ-পালিত বলিয়া একটি কুণ্ঠিত ভীরুভাবে তাহার নব-যৌবনারম্ভকে সংযত সম্বৃত করিয়া রাখিয়াছে। (পরিচ্ছেদ ২)

অবিকশিত ব্যক্তিত্ববোধের কারণে মহেন্দ্রের সংসারে স্ত্রীরূপে প্রবেশাধিকারের পরও সে তার অধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়েছে। আবার মহেন্দ্রের অতি প্রশ্রয়ের পরিপ্রেক্ষিতে দাম্পত্যঅধিকার প্রয়োগেও সে পরিমিতিবোধের স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়নি। পাতিব্রত্যের একটি সহজ তত্ত্বরহিত সংস্কার তার মধ্যে ছিল কিন্তু তার প্রয়োগকৌশল সম্পর্কে সে ছিল অনভিজ্ঞ। বিনোদিনীকে সে আবেগ দিয়ে গ্রহণ করেছে; বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করেনি।

উপন্যাসের দ্বন্দ্বজটিল পরিপ্রেক্ষিত নির্মাণে আশার অপরিণামদর্শী ভূমিকা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। উপন্যাসের প্রথম পর্যায়ে দাম্পত্যধর্ম পালনে ও সংসারযাপনে তার ভূমিকা দ্বন্দ্বমুক্ত হলেও মধ্যপর্যায়ে এসে ক্রমশ কীভাবে দ্বন্দ্বাত্মক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে ব্যক্তিত্ববোধে জাগ্রত ও দ্বন্দ্বভারমুক্ত চরিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে তা এ-উপন্যাসে পরমসূক্ষ্ম পরিচর্যায় বিন্যস্ত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। বিনোদিনীকে পটলডাঙার বাসায় রেখে মহেন্দ্র যখন স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেছে, আশার তখনকার মানসিক অভিক্ষেপ ঔপন্যাসিক শিল্পময় করে পরিবেশন করেছেন উপন্যাসে :

> আশা অন্ধকারে দাঁড়াইয়া যতই মহেন্দ্রকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল ততই তাহার মনে হইতে লাগিল, মহেন্দ্র এইমাত্র সেই বিনোদিনীর কাছ হইতে আসিতেছে, তাহার অঙ্গে সেই বিনোদিনীর স্পর্শ, তাহার চোখে সেই বিনোদিনীর মূর্তি, কানে সেই বিনোদিনীর কণ্ঠস্বর, মনে সেই বিনোদিনীর বাসনা একেবারে লিপ্ত জড়িত হইয়া আছে। এই মহেন্দ্রকে আশা কেমন করিয়া পবিত্র ভক্তি দিবে, কেমন করিয়া একাগ্রমনে বলিবে 'এসো, আমার অনন্যপরায়ণ হৃদয়ের মধ্যে এসো — আমার অটলনিষ্ঠ সতী প্রেমের শুভ্র শতদলের উপর তোমার চরণ-দুখানি রাখো'। সে তাহার মাসির উপদেশ, পুরাণের কথা, শাস্ত্রের অনুশাসন কিছুই মানিতে পারিল না — এই দাম্পত্যস্বর্গচ্যুত মহেন্দ্রকে সে আর মনের মধ্যে দেবতা বলিয়া অনুভব করিল না, সে আজ বিনোদিনীর কলঙ্কপারাবারের মধ্যে তাহার হৃদয়দেবতাকে বিসর্জন দিল। (পরিচ্ছেদ ৪২)

সংসার-পরিসরে আশালতার ক্রমপরিবর্তনশীল আচরণ, নিঃসংকোচ গতিবিধি, ব্যক্তিত্ববোধের জাগরণ প্রত্যক্ষ করে মহেন্দ্রও বিস্মিত —

> আশা আজ তাহার কাছে যে মূর্তিতে দেখা দিল, এ যেন মহেন্দ্রের পক্ষে নূতন। এ আশার মধ্যে সংকোচ নাই; এই আশা নিজের অধিকারের মধ্যে নিজে অধিষ্ঠিত, সেটুকুর জন্য

> মহেন্দ্রের নিকট সে ভিক্ষাপ্রার্থিনী নহে। নিজের স্ত্রীকে মহেন্দ্র উপেক্ষা করিয়াছে, কিন্তু বাড়ির বধূর প্রতি তাহার সম্ভ্রম জন্মিল। (পরিচ্ছেদ ৪৩)

অবশেষে মহেন্দ্র আত্মসম্বিৎপ্রাপ্ত হয়ে সংসারক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন করলেও আশালতা নির্দ্বন্দ্ব সরলতায় তাকে গ্রহণ করতে পারেনি। প্রতি মুহূর্তে সে বিপন্নবোধ করেছে, বিনোদিনীর উপস্থিতিতে আতঙ্ক-শিহরিত হয়েছে, আরেক ভ্রান্তিপাশে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় সংকুচিত হয়েছে —

> কাল রাজলক্ষ্মী যখন আশার হাত লইয়া মহেন্দ্রের হাতে দিলেন, তখন আশা তাহার মন হইতে সমস্ত অভিমান মুছিয়া ফেলিয়া সম্পূর্ণভাবে মহেন্দ্রের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। আজ বিনোদিনীকে সম্মুখে দেখিয়া তাহার খণ্ডিত প্রেমের দাহ আর শান্তি মানিল না। ইহাকে মহেন্দ্র একদিন ভালোবাসিয়াছিল, ইহাকে এখনো হয়তো মনে মনে ভালোবাসে — একথা তাহার বুকের ভিতরে ঢেউয়ের মতো ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরেই মহেন্দ্র জাগিয়া উঠিবে, বিনোদিনীকে দেখিবে — কী জানি কী চক্ষে দেখিবে। কাল রাত্রে আশা তাহার সমস্ত সংসারকে নিষ্কণ্টক দেখিয়াছিল — আজ প্রত্যুষে উঠিয়াই দেখিল, কাঁটাগাছ তার ঘরের প্রাঙ্গণেই। সংসারে সুখের স্থানই সব চেয়ে সংকীর্ণ, কোথাও তাহাকে সম্পূর্ণ নির্বিঘ্নে রাখিবার অবকাশ নাই। (পরিচ্ছেদ ৫৩)

আশালতার এই মনোজাগতিক টানাপড়েন, এ-দ্বন্দ্বাত্মক জীবনোপলব্ধির মধ্যেই নিহিত রয়েছে তার চারিত্রিক সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য।

এ-উপন্যাসে পরিপ্রেক্ষিতের চরিত্র হিসেবে অন্নপূর্ণা উল্লেখযোগ্য। উপন্যাসের রস-রসায়ন তৈরিতে তিনি পালন করেছেন অনুঘটকের ভূমিকা।

পাঁচ

চোখের বালি উপন্যাসে ঘটনাংশের অন্তর্বয়নে ব্যবহৃত হয়েছে ঔপন্যাসিকের সর্বদর্শী প্রেক্ষণবিন্দু। এর বর্ণনা-বিবৃতি পূর্বাপর পরিমিত ও সুষম। যখন বিশেষ কোনো চরিত্রকে কেন্দ্র করে ঘটনাংশ হয়ে উঠেছে ঘনীভূত, তখন রবীন্দ্রনাথ ওই চরিত্রের প্রেক্ষণবিন্দু ব্যবহার করে ঘটনা ও চরিত্রকে করে তুলেছেন গতিময়। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ যে কতবেশি সূক্ষ্ম ও নিপুণ কথাকোবিদ তা প্রমাণিত হয় ২-সংখ্যক পরিচ্ছেদে। এই পরিচ্ছেদে দেখা যায়, বিবাহ-ভাবনায় উদ্দীপিত হয়ে বিহারী যাচ্ছে শ্যামবাজারে, অনুকূল বাবুর বাড়িতে, আশালতা-সন্দর্শনে; সংগত কারণেই প্রত্যাশিত ছিল বিহারীর আবেগ-উদ্বেল প্রেক্ষণবিন্দু থেকে রবীন্দ্রনাথ নির্মাণ করবেন আশালতাবিষয়ক তার অন্তর্ভাবনা। কিন্তু বিস্ময়করভাবে তিনি ব্যবহার করলেন মহেন্দ্র-চরিত্রের ভাবনাশ্রয়ী প্রেক্ষণবিন্দু। আপাতদৃষ্টিতে বিষয়টি অস্বাভাবিকতামণ্ডিত মনে হলেও অতিদ্রুত ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয় যখন আশালতাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করে মহেন্দ্র। এভাবে রবীন্দ্রনাথ পরমসূক্ষ্ম নৈপুণ্যের সঙ্গে সর্বদর্শী প্রেক্ষণবিন্দুর সঙ্গে কখনো বিনোদিনী, কখনো মহেন্দ্র, কখনো বিহারী অথবা আশালতার প্রেক্ষণবিন্দু ব্যবহার করে ঘটনাংশকে করে তুলেছেন দ্বন্দ্বময়, প্রাগ্রসর ও পরিণামমুখী।

ছয়

চোখের বালি উপন্যাসের প্রকরণ-পরিচর্যায় রবীন্দ্রনাথ অভূতপূর্ব দক্ষতার স্বাক্ষর উৎকীর্ণ করেছেন। সরল তথ্যধর্মী বর্ণনার সঙ্গে সংলাপধর্মী, কখনো বিশ্লেষণধর্মী, কখনো চিত্রধর্মী, কখনো গীতধর্মী আবার কখনো বা প্রতীকী-চিত্রকল্পময় প্রকরণকৌশল সহযোগে তিনি উপন্যাসটিকে করে তুলেছেন শিল্পরূপময়। উপন্যাসটির শুরুই হয়েছে সরল তথ্যধর্মী বর্ণনা সহযোগে। অতঃপর চরিত্রচিত্তের সংলাপ-প্রতিসংলাপের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে উপন্যাস; ব্যবহৃত হয়েছে ইঙ্গিতময় ও ব্যঞ্জনাধর্মী শব্দ। উপন্যাসের ১-সংখ্যক পরিচ্ছেদের প্রথম অনুচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ বিনোদিনীর পারিবারিক অবস্থান সরল ও তথ্যধর্মী বর্ণনায় বিবৃত করেছেন এভাবে :

> বিনোদিনীর মাতা হরিমতি মহেন্দ্রের মাতা রাজলক্ষ্মীর কাছে আসিয়া ধন্না দিয়া পড়িল। দুইজনেই এক গ্রামের মেয়ে, বাল্যকালে একত্রে খেলা করিয়াছেন।

'ধন্না' শব্দটির মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ বিনোদিনীর মা হরিমতি এবং রাজলক্ষ্মীর অর্থনৈতিক স্তরভেদের বিষয়টি করে তুলেছেন স্পষ্ট। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে মহেন্দ্রের উদ্দেশে উচ্চারিত রাজলক্ষ্মীর সংলাপে এ-বিষয়টি হয়ে উঠেছে অনেক বেশি প্রত্যক্ষযোগ্য ও স্পষ্ট :

> বাবা মহিন, গরিবের মেয়েটিকে উদ্ধার করিতে হইবে। শুনিয়াছি মেয়েটি বড়ো সুন্দরী, আবার মেমের কাছে পড়াশুনাও করিয়াছে — তোদের আজকালকার পছন্দর সঙ্গে মিলিবে।

উদ্ধৃতাংশের 'উদ্ধার' শব্দটির মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ বিনোদিনীর অবস্থানকে অনেক বেশি করুণার্দ্র করে তুললেও প্রসংগত তার অহংবোধের কার্যকারণও করে তুলেছেন সুচিহ্নিত।

বক্তব্য স্পষ্ট করবার জন্য অব্যর্থ শব্দব্যবহারের সঙ্গে উপন্যাসে প্রযুক্ত হয়েছে অলংকার। যেমন, মহেন্দ্রের সঙ্গে তার মায়ের নিবিড় সম্পর্কের স্বরূপ চিত্রণে ব্যবহৃত হয়েছে লক্ষ্যভেদী উপমা —

> কাঙারু-শাবকের মতো মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াও মাতার বহির্গর্ভের থলিটির মধ্যে আবৃত থাকাই তাহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। (পরিচ্ছেদ ১)

কিছুদূর অগ্রসর হয়ে রবীন্দ্রনাথ পাঠকচিত্তকে ক্লান্তিকর একঘেয়ে অবস্থা থেকে মুক্ত করবার অভিপ্রায়ে ব্যবহার করেছেন হাস্যরসাত্মক পরিচর্যা। বিনোদিনীকে বিয়ে করতে মহেন্দ্র অসম্মতি জ্ঞাপন করলে মা রাজলক্ষ্মী বিহারীকে অনুরোধ করেছেন দরিদ্র এ-মেয়েটিকে উদ্ধার করবার জন্য। প্রত্যুত্তরে বিহারী বলেছে —

> "মা, ঐটে পারিব না। যে মেঠাই তোমার মহেন্দ্র ভালো লাগিল না বলিয়া রাখিয়া দেয়, সে মেঠাই তোমার অনুরোধে পড়িয়া আমি অনেক খাইয়াছি; কিন্তু কন্যার বেলায় সেটা সহিবে না। (পরিচ্ছেদ ১)

এভাবে সূক্ষ্ম হাস্যরসই শুধু নয়, পরিচর্যাকৌশলের বৈচিত্র্যময় প্রয়োগের মাধ্যমে তিনি পাঠকচৈতন্যকে উপন্যাসের ঘটনাংশের সঙ্গে আরো নিবিষ্ট করে তুলেছেন। মূলত উপন্যাস যে সরল-সাধারণ বর্ণনা-বিবৃতির মাধ্যমে গল্পকাহিনীর নিছক বয়ান নয়, বরং তা যে মনন ও মেধার বিস্ময়কর অন্তর্বয়ন তা এ-উপন্যাসের প্রতিটি স্তরে সুলক্ষ্য।

উপন্যাসের বর্ণনাংশ-যোজনায় রবীন্দ্রনাথ পূর্বাপর সতর্ক ও সংযমী। অহেতুক বিশ্লেষণ-প্রবণতা থেকে তিনি মুক্ত। যেমন, মহেন্দ্র-আশালতার বিবাহ প্রসঙ্গে তাঁর এ-সংযম শিল্পপ্রমূর্তিতে উজ্জ্বল :

> বাতি উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিল, সানাই মধুর হইয়া বাজিল, মিষ্টান্নে মিষ্টের ভাগ লেশমাত্র কম পড়িল না। (পরিচ্ছেদ ৩)

কখনো কখনো চিত্রাত্মক পরিচর্যার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস-অন্তর্গত ঘটনা, চরিত্র ও পট-পরিবেশকে করে তুলেছেন চিত্তাকর্ষক ও প্রাণময়। দীর্ঘ বর্ণনাংশ নয়, ক্ষুদ্র-খণ্ড ও স্বল্পপরিসর দৃশ্যযোজনার মাধ্যমে তিনি সম্পাদন করেছেন বিরল সার্থকতা। যেমন :

> ১. কিছুকাল অনাবৃষ্টিতে যে শস্যদল শুষ্ক পীতবর্ণ হইয়া আসে, বৃষ্টি পাইবামাত্র সে আর বিলম্ব করে না; হঠাৎ বাড়িয়া উঠিয়া দীর্ঘকালের উপবাসদৈন্য দূর করিয়া দেয়, দুর্বল নতভাব ত্যাগ করিয়া শস্যক্ষেত্রের মধ্যে অসংকোচে অসংশয়ে আপনার অধিকার উন্নত ও উজ্জ্বল করিয়া তোলে — আশার সেইরূপ হইল। (পরিচ্ছেদ ৫)
> ২. রাজলক্ষ্মী জন্মস্থান দেখিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক ছিলেন না। গ্রীষ্মে নদী যখন কমিয়া আসে তখন মাঝি যেমন পদে পদে লগি ফেলিয়া দেখে কোথায় কত জল, রাজলক্ষ্মীও তেমনি ভাবান্তরের সময় মাতাপুত্রের সম্পর্কের মধ্যে লগি ফেলিয়া দেখিতেছিলেন। (পরিচ্ছেদ ৬)

চরিত্রচিত্তের হতাশা-ব্যর্থতা, ঈর্ষা ও অন্তর্দাহ উপস্থাপনায় রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন চিত্রকল্পময় পরিচর্যাকৌশল। যেমন :

> ১. প্রদীপের মুখ হইতে যেমন জ্বলন্ত তৈলবিন্দু ক্ষরিয়া পড়ে, রুদ্ধ শয়নকক্ষের মধ্যে বিনোদিনীর দীপ্ত নেত্র হইতে তেমনি হৃদয়ের জ্বালা অশ্রুজলে গলিয়া পড়িতে লাগিল। (পরিচ্ছেদ ২৪)
> ২. নিমেষের মধ্যে বিনোদিনীর চোখে বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইল। এতক্ষণ ফুলশর ঘরের কোণে খেলা করিতেছিল; সে যেন দ্বিতীয় বার ভস্মসাৎ হইয়া গেল। (পরিচ্ছেদ ২৮)
> ৩. ঘড়িতে যখন একটা বাজিল, তখন মহেন্দ্র আর থাকিতে পারিল না, মশারি খুলিয়া বাহির হইয়া পড়িল। ছাদে আসিয়া দেখিল, গ্রীষ্মের জ্যোৎস্নারাত্রি বড়ো রমণীয় হইয়াছে। কলিকাতার প্রকাণ্ড নিঃশব্দতা এবং সুপ্তি যেন স্তব্ধ সমুদ্রের জলরাশির ন্যায় স্পর্শগম্য বলিয়া বোধ হইতেছে; অসংখ্য হর্ম্যশ্রেণীর উপর দিয়া মহানগরীর নিদ্রাকে নিবিড়তর করিয়া বাতাস মৃদুগমনে পদচারণ করিয়া আসিতেছে। (পরিচ্ছেদ ৩২)

উপর্যুক্ত তিনটি বর্ণনাংশে ইন্দ্রিয়জ বিষয়াংশের সঙ্গে অতীন্দ্রিয় কল্পনানুভূতির সাধিত হয়েছে বিস্ময়কর সংযোগ। এসব চিত্রকল্পাত্মক বর্ণনাংশ কল্পনাকে উদ্দীপিত করে, বস্তুঅতিক্রমী অনুভূতিময় সত্তাকে আন্দোলিত করে, সহৃদয় পাঠকের সূক্ষ্ম আবেগানুভূতিকে রোমান্টিক অনুভাবনায় রঞ্জিত করে।

চোখের বালি উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ প্রায়শ বর্ণনাত্মক পরিচর্যার পরিবর্তে চরিত্রের অন্তর্গত ভাব-ভাবনা, হতাশা-ব্যর্থতা প্রতীকী-সংকেতময় পরিচর্যায় বিন্যস্ত করেছেন। শ্যামবাজারে আশালতাকে দেখবার জন্য মহেন্দ্র যখন সেজেগুজে গন্ধ মেখে বিহারীকে নিয়ে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করে, মহেন্দ্র-চিত্তের সে-সময়কার উদ্দাম চাঞ্চল্য রবীন্দ্রনাথ প্রতীকী পরমার্থমণ্ডিত করে উপস্থাপন করেছেন এভাবে —

> মহেন্দ্র বিহারীকে লইয়া আলজ্জিতভাবে খাইতে বসিয়াছেন। নীচে বাগানে মালী তখন ঝারিতে করিয়া গাছে গাছে জল দিতেছিল; সেই সিক্ত মৃত্তিকার স্নিগ্ধ গন্ধ বহন করিয়া চৈত্রের দক্ষিণবাতাস মহেন্দ্রের শুভ্র কুঞ্চিত সুবাসিত চাদরের প্রান্তকে দুর্দাম করিয়া তুলিতেছিল। (পরিচ্ছেদ ২)

রাজলক্ষ্মী-অন্নপূর্ণার অনুপস্থিতিতে আশা-মহেন্দ্রের লাগামহীন প্রণয়াভ্যাসের অশুভ পরিণাম ইঙ্গিতায়িত হয়েছে কোকিলের মৃত্যুর প্রতীকাভাসে —

> মহেন্দ্র খাঁচা পাড়িয়া নামাইল। খাঁচার উপরের আবরণ খুলিয়া দেখিল, পাখি মরিয়া গেছে। (পরিচ্ছেদ ৮)

বিনোদিনীর প্রতি প্রেমানুরাগের পরিপ্রেক্ষিতে স্ত্রী আশালতার প্রতি মহেন্দ্র প্রদর্শন করছে রহস্যময় বিরূপতা। রবীন্দ্রনাথ বেদনাহত আশার এ-সময়কার মনোজাগতিক স্বরূপ প্রকৃতির প্রতীকে অঙ্কন করেছেন এভাবে —

> সূর্যাস্তের আভা অন্ধকারে মিশাইয়া গেল, সন্ধ্যারম্ভের ক্ষণিক বসন্তের বাতাস গিয়া শীতের হাওয়া দিতে লাগিল — তখনো আশা সেই মাদুরের উপর লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া রহিল। (পরিচ্ছেদ ২৫)

পটলডাঙার বাসায় বিহারীভাবনায় সমর্পিত বিনোদিনীকে অর্জনে ব্যর্থ হয়ে মহেন্দ্র যখন নৈরাশ্যমথিত হাহাকারে বিদীর্ণ, বিনোদিনীর তখনকার মনোভাবনা রূপায়ণে রবীন্দ্রনাথের বর্ণনাংশ এরকম —

> বিনোদিনী সেলাইয়ে একটা ভুল করিয়া আলোর কাছে ধরিয়া তাহা বহু যত্নে পুনর্বার খুলিতে লাগিল। (পরিচ্ছেদ ৪১)

মহেন্দ্রকে কেন্দ্র করে বিনোদিনীর ভ্রান্তিসংকুল সিদ্ধান্ত এবং তা থেকে উজ্জ্বল উত্তরণের স্পৃহা প্রতীকায়িত হয়েছে উপর্যুক্ত উদ্ধৃতাংশে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন ও শিল্পভাবনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে চরিত্রচিত্তের তীব্র ও বিপুল বেদনাকে তিনি তুচ্ছ করে দেখেন। তিনি মনে করেন ব্যক্তিমানুষের দুঃখ-বেদনা যতই প্রবল হোক না কেন, বিরাট বহির্বিশ্বে তার কোনো চিহ্নই পড়ে না। একজন মানুষের দুঃখ বা শোক বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিতের কাছে নিতান্তই তুচ্ছ। মহেন্দ্রের সংসারে অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটের পরিপ্রেক্ষিতে বিনোদিনী যখন অনিকেত জীবনপরিণামে সমর্পিত, দুঃখ-দাহ হয়ে উঠেছে তার ললাটলিখন, সেই মুহূর্তবদ্ধ পট-পরিপ্রেক্ষিত রবীন্দ্র-বর্ণনায় এরকম —

> ... মহেন্দ্র চলিয়া গেল।
> এমন সময় ধোবা আসিয়া বিনোদিনীকে কহিল, "মাঠাকরুন, আর তো বসিতে পারি না। আজ যদি তোমাদের ফুরসত না থাকে তো আমি কাল আসিয়া কাপড় লইয়া যাইব।"
> খেমি আসিয়া কহিল, "বউঠাকরুন, সহিস বলিতেছে দানা ফুরাইয়া গেছে।"...
> গোপাল-চাকর আসিয়া কহিল, "বউঠাকরুন, ঝড়ু-বেহারা আজ দাদামশায়ের (সাধুচরণের) সঙ্গে ঝগড়া করিয়াছে। সে বলিতেছে, তাহার কেরোসিনের হিসাব বুঝিয়া লইলেই সে সরকার-বাবুর কাছ হইতে বেতন চুকাইয়া লইয়া কাজ ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইবে।"
> সংসারের সমস্ত কর্মই পূর্ববৎ চলিতেছে। (পরিচ্ছেদ ৩৪)

বক্তব্যকে পরিশীলিত, শিল্পিত ও আকর্ষণীয় করার জন্য যেমন, ঠিক তেমনি অর্থের খাতিরে এবং বক্তব্য স্পষ্ট করার প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথ এ-উপন্যাসে অজস্র উপমা-অলংকার নির্মাণ করেছেন। যে-সমস্ত উপমায় উপমেয় ও উপমান-উৎস নির্বাচনে অভূতপূর্ব অভিনবত্ব প্রদর্শিত হয়েছে সেগুলোর কয়েকটি নিম্নরূপ :

১. যখন কোনো প্রবল অভিভাবক একটা ইক্ষুদণ্ডের সমস্ত রস প্রায় নিঃশেষপূর্বক চর্বণ করিতে থাকে তখন হতাশ্বাস লুব্ধ বালকের ক্ষোভ উত্তরোত্তর যেমন অসহ্য বাড়িয়া উঠে, মহেন্দ্রের সেই দশা হইল। (পরিচ্ছেদ ৪)

২. তাহার মৃত্যুর পর হইতে বিনোদিনী, জঙ্গলের মধ্যে একটিমাত্র উদ্যানলতার মতো, নিরানন্দ পল্লীর মধ্যে মুহ্যমানভাবে জীবনযাপন করিতেছিল। (পরিচ্ছেদ ৭)

৩. জাদুকরের মায়াতরুর মতো তাহাদের প্রণয়বীজ একদিনেই অঙ্কুরিত পল্লবিত ও পুষ্পিত হইয়া উঠিল। (পরিচ্ছেদ ১০)

৪. সোহাগের সঙ্গে রাগ না মিশিলে ভালোবাসার স্বাদ থাকে না — তরকারিতে লঙ্কামরিচের মতো। (পরিচ্ছেদ ১১)

৫. জ্যোৎস্নায় স্তম্ভিত তরুশ্রেণী ধাবমান নিবিড় ছায়াস্রোতের মতো তাহার চোখের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। (পরিচ্ছেদ ১৭)

৬. বিনোদিনী তাহার প্রতি জ্বলন্ত বজ্রের মতো একটা কঠোর কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল। (পরিচ্ছেদ ২৩)

৭. ...তাহার স্পর্শের সুকোমল উত্তাপ বিহারীকে বেষ্টন করিয়া পুলকাবিষ্ট হৃদয়কে ফুলের মতো ফুটাইয়া রাখিয়াছে। (পরিচ্ছেদ ৪৮)

চোখের বালি উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিকে সত্তাময় ও ব্যক্তিত্বময় করে উপস্থাপন করেছেন। প্রকৃতির সান্নিধ্যে-সাহচর্যে, সঙ্গ ও শুশ্রূষায় মানবচরিত্রের মনোজাগতিক যে রূপ-রূপান্তর সাধিত হয় তা উপন্যাসে প্রদর্শন করেছেন তিনি। দমদমের বাগানে চড়িভাতিকে উপলক্ষ করে বিনোদিনীর পরিবর্তিত সত্তায় উত্তরণ যে একান্তই ইষ্টকবন্ধনমুক্ত মধ্যাহ্ন-প্রকৃতির নন্দিত স্পর্শে সম্ভব হয়ে উঠেছে তা নিঃসন্দেহ। বর্ণনাংশটি লক্ষণীয় :

ক্ষণে ক্ষণে উষ্ণ মধ্যাহ্নের বাতাস তরুপল্লব মর্মরিত করিয়া চলিয়া গেল, ক্ষণে ক্ষণে দিঘির পাড়ে জাম গাছে ঘনপত্রের মধ্য হইতে কোকিল ডাকিয়া উঠিল। বিনোদিনী তাহার ছেলেবেলাকার কথা বলিতে লাগিল, তাহার বাপ-মায়ের কথা, তাহার বাল্যসাথির কথা। বলিতে বলিতে তাহার মাথা হইতে কাপড়টুকু খসিয়া পড়িল; বিনোদিনীর মুখে খরযৌবনের যে একটি দীপ্তি সর্বদাই বিরাজ করিত, বাল্যস্মৃতির ছায়া আসিয়া তাহাকে স্নিগ্ধ করিয়া দিল। (পরিচ্ছেদ ১৭)

উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ কখনো কখনো সর্বজ্ঞ প্রেক্ষণবিন্দু থেকে আবার কখনো বা চরিত্রপাত্রের মাধ্যমে এমন কিছু মননশীল প্রবাদ ও বচনধর্মী বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন যেগুলো সর্বকালিক অভিব্যঞ্জনায় ভাস্বর। যেমন :

১. ...কন্যা দেখিবার প্রসঙ্গমাত্রেই যৌবনধর্ম আপনি চুলটা একটু ফিরাইয়া লয়, চাদরে কিছু গন্ধ ঢালে। (পরিচ্ছেদ ২)

২. শিক্ষক যদি শিক্ষার সর্বপ্রধান অন্তরায় হন, তবে অবলা ছাত্রীর সাধ্য কী বিদ্যারণ্যের মধ্যে পথ করিয়া চলে। (পরিচ্ছেদ ৫)

৩. কাজের মধ্যেই প্রেমের মূল না থাকিলে ভোগের বিকাশ পরিপূর্ণ এবং স্থায়ী হয় না। (পরিচ্ছেদ ৮)

৪. ভোগসুখের এই ভয়ংকর অভিশাপ যে, সুখ অধিক দিন থাকে না কিন্তু বন্ধন দুশ্ছেদ্য হইয়া উঠে। (পরিচ্ছেদ ১০)

৫. ...শিখা এক ভাবে ঘরের প্রদীপরূপে জ্বলে, আর-এক ভাবে ঘরে আগুন ধরাইয়া দেয়। (পরিচ্ছেদ ১২)

৬. "...চিকিৎসা করিয়া রোগ সারানোর চেয়ে রোগ না হইতে দেওয়াই ভালো।" (পরিচ্ছেদ ১৫)

৭. ...গৃহকর্মশিক্ষা নিয়ত অভ্যাস ও অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ। (পরিচ্ছেদ ১৮)

৮. ...নাটকের নায়িকা স্টেজের উপরেই শোভা পায়, ঘরে তাহাকে লইয়া চলে না। (পরিচ্ছেদ ৩৬)

৯. পদ্মকে তুলিতে গেলে পঙ্ক উঠিয়া পড়ে। (পরিচ্ছেদ ৪৮)

১০. অধিকার লাভের যে মর্যাদা আছে সেই মর্যাদা রক্ষা করিতে হইলে অধিকার প্রয়োগকে সংযত করিতে হয়। (পরিচ্ছেদ ৫৩)

১১. যতটা পাওয়া যায় ততটা লইয়া টানাটানি করা কাঙালকেই শোভা পায় — ভোগকে খর্ব করিলেই সম্পদের যথার্থ গৌরব। (পরিচ্ছেদ ৫৩)

*চোখের বালি*র ভাষাব্যবহারে রবীন্দ্রনাথের সর্বাধিক কৃতিত্ব এখানে যে, তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীতে রচিত ঔপন্যাসিক-ভাষার সঙ্গে এ-ভাষার সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য সম্পাদনে সক্ষম হয়েছেন। অবশ্য এ-ভাষা একান্ত রাবীন্দ্রিক হওয়া সত্ত্বেও চকিতে কখনো-কখনো উঁকিঝুঁকি মেরেছে বঙ্কিমী-প্রভাব। দুটি উদ্ধৃতি লক্ষণীয়, প্রথমটি *চোখের বালি*র, দ্বিতীয়টি বঙ্কিমচন্দ্রের *কৃষ্ণকান্তের উইলে*র —

১. এই সময়ে মহেন্দ্র যদি একটিবার ডাকিত 'চুনি' — তবে তখনই সে মহেন্দ্রের সমস্ত অপরাধ যেন নিজেরই মাথায় তুলিয়া লইয়া ক্ষমাপ্রাপ্ত অপরাধিনীর মতো মহেন্দ্রের দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার জীবনের সমস্ত কান্নাটা কাঁদিয়া লইত। কিন্তু, মহেন্দ্র সে প্রিয়নাম ডাকিতে পারিল না। যতই চেষ্টা করিল, ইচ্ছা করিল, যতই সে বেদনা পাইল, এ কথা ভুলিতে পারিল না যে, আজ আশাকে আদর করা শূন্যগর্ভ পরিহাসমাত্র। (পরিচ্ছেদ ৫৩)

২. সেই সময়ে যদি গোবিন্দলাল দুই পা ফিরিয়া গিয়া, ভ্রমরের রুদ্ধ দ্বার ঠেলিয়া একবার বলিতেন — "ভ্রমর, আমি আবার আসিতেছি," তবে সকল মিটিত। গোবিন্দলালের অনেক বার সে ইচ্ছা হইয়াছিল। ইচ্ছা হইলেও তাহা করিলেন না। ইচ্ছা হইলেও একটু লজ্জা করিল। ভাবিলেন, এত তাড়াতাড়ি কি ? যখন মনে করিব, তখন ফিরিব। ভ্রমরের কাছে গোবিন্দলাল অপরাধী। (প্রথম খণ্ড : একবিংশ পরিচ্ছেদ)

ঊনবিংশ শতাব্দীতে রচিত সমাজ-ইতিহাসাশ্রয়ী রোমান্স রচনার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র যে ভাষা ব্যবহার করেছেন সে-ভাষা ছিল পরিচিত প্রাত্যহিক জীবনের দূরবর্তী; কিন্তু *চোখের বালি*তে ব্যবহৃত হয়েছে জনজীবন-সন্নিহিত ভাষা। পরিবার ও সমাজ-জীবনাশ্রয়ী মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস রচনার জন্য তিনি পরিচিত সামাজিক পট-পরিবেশের অনুকূল ভাষাভঙ্গিই ব্যবহার করেছেন। এ-ভাষা কখনো কবিতাময়, কখনো অনুভূতিস্নিগ্ধ এবং কখনো বা নাটকীয়তায় স্পন্দিত। 'মনোজীবনের গভীরে প্রবেশের যোগ্যতা অর্জনে *চোখের বালি*র ভাষা যে-সামর্থ্য দেখিয়েছে, তার মধ্যেই নিহিত লেখকের স্বকীয় ভাষারীতির রহস্য' (গোপিকানাথ ১৯৮৪ :

২১৬)। উপন্যাসের অন্তর্নিহিত বিষয়ভাবের সঙ্গে এ-ভাষার যোগ একান্তই নিবিড়।

*চোখের বালি*তে চরিত্রপাত্রের পারস্পরিক সংঘাত ও অন্তর্দ্বন্দ্বময় পরিস্থিতি সৃজনে নাটকীয় উত্তেজনার সম্ভাবনা পরিদৃশ্যমান হলেও রবীন্দ্রনাথ ভাষিক পরিচর্যায় তাকে করে তুলেছেন শান্ত ও সংহত। বিহারীর গৃহে বিনোদিনীর অপ্রত্যাশিত উপস্থিতি এবং বিহারীর প্রতি তার প্রণয় নিবেদনের সেই রোমাঞ্চকর দৃশ্যের বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথের ভাষা নিস্তরঙ্গ ও শৈত্যসমাহিত —

> ...বিনোদিনী চোখ বুজিয়া তাহার ওষ্ঠাধর বিহারীর কাছে অগ্রসর করিয়া দিল। মুহূর্তকালের জন্য দুইজনে নিশ্চল এবং সমস্ত ঘর নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার পর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বিহারী ধীরে ধীরে বিনোদিনীর হাত ছাড়াইয়া লইয়া অন্য চৌকিতে গিয়া বসিল এবং রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করিয়া লইয়া কহিল, "আজ রাত্রি একটার সময় একটা প্যাসেঞ্জার-ট্রেন আছে।" (পরিচ্ছেদ ৩৫)

এ-উপন্যাসে চরিত্রের মনোজীবনের চিত্রাঙ্কনে রবীন্দ্রনাথের ভাষা অনেকবেশি অনুভূতিস্নিগ্ধ, অন্তর্ময় এবং গীতাত্মক আবহমণ্ডিত। মেধাবী ও মননশীল চরিত্রপুঞ্জের চরণ-বিচরণে উপন্যাসের ঘটনাংশে যেমন বিরল সৌন্দর্যব্যঞ্জনা তৈরি হয়েছে, ঠিক তেমনি ভাষারীতিতেও সঞ্চারিত হয়েছে কবিতার অপরূপ স্নিগ্ধতা ও রূপলাবণ্য। যেমন :

> অলস মধ্যাহ্নের উত্তপ্ত হাওয়ায় ঘরের পর্দা উড়িতে লাগিল এবং প্রাচীরের কাছে কম্পমান নারিকেল গাছের অর্থহীন মর্মরশব্দ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। মহেন্দ্রের হৃৎপিণ্ড ক্রমশই দ্রুততর তালে নাচিতে লাগিল এবং বিনোদিনীর ঘন নিশ্বাস সেই তালে মহেন্দ্রের কপালের চুলগুলি কাঁপাইতে লাগিল। কাহারো কণ্ঠ দিয়া একটি কথা বাহির হইল না। (পরিচ্ছেদ ২৮)

চোখের বালি উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ ঘটনাবিন্যাসে এবং শৈল্পিক নিরীক্ষায় সনিষ্ঠ সংযম ও পরিমিতিবোধ প্রদর্শন করলেও ৩৫ থেকে ৩৮-সংখ্যক পরিচ্ছেদ পর্যন্ত তিনি কালগত পারম্পর্যরক্ষায় যে মনোযোগী ছিলেন একথা বলা যাবে না। ৩৫-সংখ্যক পরিচ্ছেদে বিনোদিনী বৃষ্টিসিক্ত সন্ধ্যালোকে অপ্রত্যাশিতভাবে বিহারীর গৃহে উপস্থিত হয়ে তার প্রতি প্রণয়েচ্ছা জ্ঞাপন করলে বিনোদিনীকে উদ্দেশ্য করে নিরুপায় বিহারী বলেছে — "আজ রাত্রি একটার সময় একটা প্যাসেঞ্জার-ট্রেন আছে", বিনোদিনীও সম্মতিজ্ঞাপন করে বলেছে "সেই ট্রেনেই যাইব।" অতঃপর ৩৬-সংখ্যক পরিচ্ছেদে দেখা যায় — রাত্রি আটটার সময় বিনোদিনী-শূন্য গৃহে বিহারী একা। ৩৭-সংখ্যক পরিচ্ছেদে বিহারীর গৃহে মহেন্দ্রের উপস্থিতি এবং নিঃসঙ্গ প্রস্থান। অতঃপর ৩৮-সংখ্যক পরিচ্ছেদের শুরুতে যে বর্ণনাংশ যোজিত হয়েছে তা নিম্নরূপ :

> বিনোদিনী যখন যাত্রিশূন্য মেয়েদের গাড়িতে চড়িয়া বাতায়ন হইতে চষা মাঠ ও ছায়াবেষ্টিত এক-একখানি গ্রাম দেখিতে পাইল, তখন তাহার মনে স্নিগ্ধনিভৃত পল্লীর জীবনযাত্রা জাগিয়া উঠিল। সেই তরুচ্ছায়াবেষ্টনের মধ্যে তাহার স্বরচিত কল্পনানীড়ে নিজের প্রিয় বইগুলি লইয়া কিছু-কাল-নগরবাসের সমস্ত ক্ষোভ দাহ ও ক্ষতবেদনা হইতে সে যে শান্তিলাভ করিতে পারিবে, এই কথা তাহার মনে হইতে লাগিল। গ্রীষ্মের শস্যশূন্য দিগন্তপ্রসারিত ধূসর মাঠের মধ্যে সূর্যাস্তদৃশ্য দেখিয়া বিনোদিনী ভাবিতে লাগিল, আর যেন কিছুর দরকার নাই—

স্পষ্টতই বর্ণনাংশটি পূর্ববর্তী তিনটি পরিচ্ছেদে বর্ণিত সময়কালের সঙ্গে অসংগতিময়। এ-অসংগতি উপন্যাসের বিষয়ভাবকে বিপ্রতীপ স্রোতে আন্দোলিত না করলেও এই ত্রুটি অনাকাঙ্ক্ষিত। 'আধুনিক বাংলা উপন্যাসের স্থপতি রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে এ জাতীয় অসতর্কতা যতো না পীড়াদায়ক, ততোধিক বিস্ময়কর ও অবিশ্বাস্য' (সৈয়দ ১৩৮৮ : ১৮০)। মূলত অবিশ্বাস্য এরকম ত্রুটি-বিচ্যুতিকে অঙ্গীকার করেও *চোখের বালি* বাংলা উপন্যাসের মহত্তম সৃষ্টি। আধুনিক বাংলা উপন্যাসের স্বপ্নময় পথযাত্রায় এ-উপন্যাস সহৃদয় সামাজিকের এক মুগ্ধকর দলিল।

গ্রন্থপঞ্জি

গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪, *রবীন্দ্র উপন্যাসের নির্মাণশিল্প*, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা।

বঙ্কিম রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), দ্বাদশ প্রকাশ ১৩৯৫, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কার্তিক ১৪১০, *চোখের বালি*, বিশ্বভারতী, কলকাতা।

সত্যব্রত দে, আগস্ট ১৯৭১, *রবীন্দ্র-উপন্যাস সমীক্ষা*, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, জুন ১৯৮০, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, দে'জ পবলিশিং, কলিকাতা।

সৈয়দ আকরম হোসেন, বৈশাখ ১৩৮৮, *রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : চেতনালোক ও শিল্পরূপ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।